দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৬ ঈসায়ী

শরীয়াতের আহকাম আর্কাইভ- ২০১৫

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের
নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র
২০১৫ ঈসায়ী

সূচীপত্র

তাকওয়া হাসিলের উপায়..... ৪

মুসলিম জীবনের আদব-কায়দা..... ১৯

মুসলমানদের ১৫ টি প্রশংসনীয় চারিত্রিক গুনাবলী.....৩৭

সুযোগের সদ্ব্যবহার না করার ভয়াবহতা (১) ৪৭

কোরবানির মূলশিক্ষা.....৬০

সতর্কতার মধ্যম পন্থা ৬৪

কুরআনের আলোকে ইবাদুর রহমানের পরিচয় ও গুণাবলী.....৭৯

১০০টি কবীরা গুনাহ:..... ৮৮

গণতন্ত্র দিয়ে কি মনজিলে মকসুদে পৌঁছা যাবে.....৯৫

যে কারনে আমি গণতন্ত্রের মানহায পরিত্যাগ করলাম ১১০

গণতন্ত্র কুফফারদের খেজুরের তৈরি মূর্তি.....১১৪

নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের দিক থেকে মানুষ ৪ প্রকার ১১৭

পাঁচ স্তরের নামাজীর মধ্যে আপনি কোন স্তরে?..... ১২৭

আল্লাহর যিকির : সুফল ও উপকারিতা..... ১৩১

তাকওয়া হাসিলের উপায়

musafir২

Senior Member

০৭-২৫-২০১৫

হযরত মাওলানা মুফতি তকী উছমানী (হাফিজাহুল্লাহ)

হযরত ওলামায়ে কেরাম, তালিবে ইলম সাথীগণ ও উপস্থিত সুধিবৃন্দ!

‘ইসলাহে নফস’ বা আত্মশুদ্ধির বিষয়ে কিছু কথা আপনাদের খিদমতে পেশ করতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথমত আমি নিজেই ইসলাহের মুহতাজ। যার নিজেরই ইসলাহের প্রয়োজন, সে অন্যকে এ বিষয়ে কী বলতে পারে! দ্বিতীয়ত এ মজলিসে বুযুর্গ ব্যক্তিগণ উপস্থিত আছেন। তাঁদের উপস্থিতিতে এ বিষয়ে কিছু বলতে যাওয়া দুঃসাহসিকতাও বটে। কিন্তু বুযুর্গগণ বলেছেন, ‘আলআমরু ফাওকাল আদব’ অর্থাৎ মুরববীগণ কোনো কাজের নির্দেশ দিলে তা মান্য করাই আদব। তাই নির্দেশ পালনার্থে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আমি কুরআন মজীদের একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি। তার সামান্য ব্যাখ্যা আরজ করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা ইখলাসের সাথে বলার তাওফীক দান করুন।

আয়াতের তরজমা হল, ‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর। তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য রাস্তা তালাশ কর এবং তাঁর রাস্তায় মেহনত কর। যাতে এসব কিছুর ফলে তোমাদের সফলতা অর্জিত হয় দুনিয়াতেও, আখিরাতেও।’ (সূরা : মায়িদা : ৩৫)

তাকওয়া এক অতন্দ্র প্রহরীঃ

এ হল আয়াতের অনুবাদ। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে প্রথমে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পুরা কুরআন মজীদ তাকওয়ার নির্দেশে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে একটু পরপরই তাকওয়ার নির্দেশ এসেছে। কুরআন মজীদের রীতি হল, কোনো নির্দেশ বা বিধান জারি করার পূর্বে বা পরে সাধারণত তাকওয়ার আদেশ করা হয়। কারণ

তাকওয়াই হচ্ছে ওই বস্তু, যা মানুষকে আল্লাহ তাআলার যে কোনো হুকুম পাবন্দীর সাথে মেনে চলতে বাধ্য করে। দুনিয়ার ক্ষেত্রে দেখুন, কোনো সরকার জনগণের জন্য আইন-কানুন জারি করলে অনেক সময় তা কয়েক পয়সার বিনিময়ে বেচাকেনা হয়ে যায়। ঘুষের বাজার গরম হয়ে ওঠে, আর সে বিধানের কোনো মূল্যই থাকে না। প্রকাশ্যে তা লঙ্ঘিত হতে থাকে। আর কোনো এলাকায় আইন-কানুনের পাবন্দি থাকলেও দেখা যায়, তা কেবল পুলিশের ডান্ডা ও আদালতী ঝামেলার ভয় থাকা পর্যন্তই। এরপর আর কেউ নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা করে না। কিন্তু একান্ত নির্জনতায় এবং নিশুতি রাতের অন্ধকারেও যে জিনিস মানুষের অন্তরে অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করে তা হল আল্লাহ তাআলার ভয়।

খোদাভীতির একটি দৃষ্টান্তঃ

হযরত ওমর রা. তাঁর খেলাফতকালে লোকজনের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য রাতের বেলা মদীনা মুনাওয়ারায় টহল দিতেন। এক রাতে তাহাজ্জুদের পর টহল দিচ্ছিলেন। হঠাৎ লক্ষ করলেন, একটি ঘর থেকে কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সাধারণ অবস্থায় কারো ব্যক্তিগত কথা আড়ি পেতে শোনা জায়েয নয়। কিন্তু দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অনুমতি আছে। তো কথাবার্তার ধরন শুনে তাঁর কৌতূহল হল। তিনি ঘরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালেন এবং শুনতে পেলেন, এক বৃদ্ধা তার মেয়েকে বলছে, 'বেটি! আজ তো উটের দুধ কম হয়েছে। এত অল্প দুধ বিক্রি করে দিন গুজরান করা কষ্ট হবে। তাই দুধের সাথে একটু পানি মিশিয়ে দাও।' মেয়ে উত্তরে বলল, 'মা! আমীরুল মুমিনীন তো দুধের সাথে পানি মেশাতে নিষেধ করেছেন?' বৃদ্ধা বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন কি আমাদের দেখছেন? তিনি হয়তো নিজ ঘরে ঘুমিয়ে আছেন। তুমি নিশ্চিন্তে পানি মেশাতে পার।'এবার মেয়ে বলল, 'মা, আমীরুল মুমিনীন এখানে নেই এবং তার কোনো লোকও নেই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো আছেন! তিনি তো দেখছেন! তাঁর কাছে আমরা কী জবাব দেব?'

ওমর রা. দেয়ালের ওপাশ থেকে সব কথা শুনতে পাচ্ছিলেন। এতটুকু শুনেই তিনি চলে এলেন এবং পরদিন লোক পাঠিয়ে সে ঘরের খোঁজখবর নিলেন।

তারপর বৃদ্ধার কাছে পয়গাম পাঠালেন যে, 'আপনি সম্মত হলে আপনার মেয়ের সাথে আমার ছেলের বিয়ে দিতে চাই।'

এভাবে তাকওয়ার বদৌলতে মেয়েটি আমীরুল মুমিনীনের পুত্রবধু হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করল। এই বরকতময় ঘরের তৃতীয় পুরুষে জন্মগ্রহণ করলেন খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয রাহ., যাকে পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ বলা হয়।

তো মানুষের অন্তরে সর্বক্ষণ এই ধ্যান জাগরুক থাকা যে, 'আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন'-এর নামই তাকওয়া।

কয়েক বছর আগে এক সফরে আমেরিকার টেক্সাস প্রদেশের প্রসিদ্ধ শহর হিউস্টনে (houston) গিয়েছিলাম। 'নাসা'র (NASA) সবচেয়ে বড় কেন্দ্র সেখানেই অবস্থিত। আমার মেজবান আমাকে তা পরিদর্শন করানোর জন্য নিয়ে গেলেন। এটা 'নাইন-ইলেভেন'-এর আগের কথা। এখন কী অবস্থা জানি না। একপর্যায়ে আমরা সবচেয়ে 'গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর' অংশে প্রবেশ করলাম, যেখান থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সবার জন্য সেখানে প্রবেশের অনুমতি নেই। প্রবেশ করেই দেখতে পেলাম, দেয়ালে একটি বোর্ড লাগানো রয়েছে। তাতে স্পষ্ট অক্ষরে 'You are being watched' 'আপনার প্রতি লক্ষ রাখা হচ্ছে' বা সর্বক্ষণ আপনি আমাদের নজরে রয়েছেন। ব্যাস, এটুকুই! কোনো সিকিউরিটি গার্ড নেই, পুলিশ নেই। শুধু এটুকু লেখা যে, আপনাকে নজরদারি করা হচ্ছে।

প্রবেশকারী বোর্ডের লেখা পড়েই বুঝতে পারে যে, গোপন ক্যামেরার সাহায্যে তার প্রতিটি কার্যকলাপ লক্ষ রাখা হচ্ছে, ফলে সে তৎক্ষণাৎ সতর্ক হয়ে যায়। এমন কোনো কাজ করে না, যার ফলে তাকে জবাবদিহি বা গ্রেফতারের সম্মুখীন হতে হবে। লেখাটি পড়ে আমি ভাবলাম, 'এ বোর্ডের কারণে এখানে প্রবেশকারী সবাই সতর্ক হয়ে চলে। আহা! এ অনুভূতিই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, You are being watched by Allah taaala 'আল্লাহ তাআলা সব সময় তোমাকে দেখছেন।'

ان الله يعلم ما تفعلون

'তোমরা যা করছ, সব তিনি জানেন।'

আমাদের সবার মনে যদি এই চেতনা সদাজাগ্রত থাকে যে, প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন তাহলে আমাদের সকল সমস্যা দূর হয়ে যাবে। কেউ কারো ওপর জুলুম করবে না, একে অপরের হক নষ্ট করবে না। আল্লাহ তাআলার কোনো বিধান লঙ্ঘন করবে না। কেবল এই একটি জিনিসই মানুষকে অন্যায়-অপরাধ এবং পাপাচার ও সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত রাখতে পারে। এরই নাম তাকওয়া। নবীগণের মেহনত এবং নবী প্রেরিত হওয়া ও কিতাব নাযিল হওয়ার মূল উদ্দেশ্য হল মানুষের অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি করা।

তাকওয়া অর্জনের উপায়

কুরআন মজীদের এ আয়াতে এবং অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হল, তাকওয়া অর্জিত হবে কীভাবে? আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে তাকওয়ার নির্দেশ দানের পাশাপাশি তা অর্জনের দু'টি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। প্রথমটি হল,

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের জন্য 'ওসীলা' তালাশ কর। 'ওসীলা' কী? মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ বলেছেন, 'ওসীলা' হল নেক আমল। যত বেশি নেক আমল করবে, ততই তাকওয়া হাসিল হবে এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জিত হবে। কেউ অন্য ব্যাখ্যাও করেছেন। একটি ব্যাখ্যা হল- যার সমর্থন অন্য আয়াতেও পাওয়া যায়-'ওসীলা' তালাশ করার অর্থ এমন ব্যক্তিদের সাহচর্য গ্রহণ করা, যাঁরা তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত। এটি তাকওয়া অর্জনের সবচেয়ে সহজ ও সবচেয়ে ফলপ্রসূ পন্থা।

সোহবতের প্রভাবঃ

সোহবত বা সাহচর্যের গভীর প্রভাব রয়েছে। সোহবতের গুণে মানুষের কর্ম ও চিন্তায় এবং চরিত্র ও নৈতিকতায় পরিবর্তন আসে।

দ্বীন মূলত সোহবতের মাধ্যমেই চলে আসছে। সাহাবায়ে কেরাম রা. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহবত অবলম্বন করেছিলেন। সাহাবীদের সোহবত লাভ করেছেন তাবেঈগণ। এভাবে তাবেঈগণের সোহবত লাভ করেছেন তাবে তাবেঈগণ। তাঁদের যুগকেও গণ্য করা হয়েছে সর্বোত্তম যুগের মাঝে। তাই প্রকৃতপক্ষে বুযুর্গানে দ্বীনের সোহবতের দ্বারাই মানুষের মাঝে দ্বীন পয়দা হয়। হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ রাহ. বলেছেন,-'সাহাবায়ে কেরাম রা. হলেন নবীগণের পর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। নবীগণের পরই তাঁদের মর্যাদা। যত বড় ওলী-বুযুর্গ, পীর-মাশায়েখই হোন না কেন, সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার ধারেকাছেও কেউ পৌঁছতে পারবেন না।

পরবর্তী ব্যক্তিদের নামের শুরুতে সম্মানসূচক বিভিন্ন উপাধি ব্যবহার করা হয়। কুতুবুল আকতাব, শায়খুল ইসলাম, ফখরুল মুহাদ্দিসীন, ফকীহুল আসর ইত্যাদি বলা হয়। 'ইমাম' উপাধিতে স্মরণ করা হয়। অথচ সাহাবায়ে কেরামের নামের সাথে এ জাতীয় কোনো খেতাব ব্যবহার করা হয় না। কেউ বলে না যে, ইমাম আবু বকর রা. বা মুফতী আবু বকর রা.। কোনো সাহাবীর নামের সাথেই এমন গুরুগম্ভীর বা আড়ম্বরপূর্ণ উপাধি নেই। শাহ ছাহেব রাহ. বলেন, এর কারণ হল, সাহাবীগণের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানোর জন্য কোনো উপাধির প্রয়োজন নেই। সাহাবী বলার পর আর কিছুই বলার প্রয়োজন হয় না। সাহাবী বলা মানে সবকিছু বলা।

শেখ সাদী রাহ. সুন্দর বলেছেন-

'যার চেহারাই চাঁদের মতো, তার সাজগোজের কী প্রয়োজন!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহবতের কারণে সাহাবাগণ যে মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন 'সাহাবী' শব্দ ছাড়া অন্য কোনো বিশেষণ ব্যবহার করে তা বর্ণনা করা কঠিন।

সারকথা এই যে, দ্বীন অর্জনের মূল পদ্ধতি সোহবত। যারা মনে করে যে, শুধু বই পড়েই দ্বীনদার হয়ে যাব, তাদের ধারণা সঠিক নয়।

অনেক সময় আল্লাহওয়ালাদের সামান্য সাহচর্য মানুষের জীবনের গতিধারা পাল্টে দেয়। কবি বলেছেন-

يك زمانه صحبت با اولياء بهتر از صد ساله طاعت بى رياء

আল্লাহ ওয়ালাদের সামান্য সময়ের সোহবত একশত বছরের রিয়ামুক্ত ইবাদতের চেয়েও উত্তম!'

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী রাহ.কে কেউ বলল, হযরত! এ তো অতিরঞ্জন বলে মনে হচ্ছে। একশত বছর ইখলাসের সাথে ইবাদত করে একজন যা অর্জন করল, সামান্য সময় আল্লাহওয়ালার সোহবতে থেকেই আরেকজন তেমনি লাভবান হয়ে গেল! তা কীভাবে হয়?

হযরত রাহ. বললেন, 'ভাই! অতিরঞ্জন নয়, শত বছর না বলে যদি শত লক্ষ বছর বলা হত তাহলেও অতিশয়োক্তি হত না। কারণ ইবাদতের জন্য শুধু রিয়ামুক্ত হওয়াই যথেষ্ট নয়, তা সহীহ তরীকায় হওয়াও জরুরি। আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবতের দ্বারা ইবাদতের তরীকা সহীহ হয়। তেমনি ফিকির ও মেজাযের উন্নতি হয়। আল্লাহ তাআলার মুহাববত নিয়ে ইবাদত করতে শেখে, ফলে ইবাদত আল্লাহর দরবারে মকবুল হয় এবং তার মান বহু গুণে বেড়ে যায়।

পীর-মুরিদীর স্বরূপঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ থেকেই সোহবতের সিলসিলা চলে আসছে। দ্বীন শেখার জন্য মানুষ বুযুর্গানে দ্বীনের সোহবতে যায়, ইসলাহী তাআল্লুক কায়েম করে।

কিন্তু এখন তো পীর-মুরিদীকে এক ধাঁধাঁর বিষয় বানিয়ে ফেলা হয়েছে। এ বিষয়ে আসল কথা এই যে, মানুষ তার নিজের রোগ নিজে চিহ্নিত করতে পারে না। তাকে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হয়। যেমন অহংকার একটি রোগ। শরীয়তে তা হারাম। এতে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু কোনো অহংকারী ব্যক্তি কখনোই স্বীকার করে না যে, আমি অহংকারী। আরবী সাহিত্যে এর চমৎকার একটি উদাহরণ রয়েছে। উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় কেউ দাঁড়ালে তার কাছে নিচের সবকিছুই ছোট ছোট মনে হবে। মানুষ, ঘরবাড়ি, গাছপালা সবকিছুই দেখা যাবে অনেক ছোট। এখন তার কাছে মনে হবে দুনিয়ার সবকিছুই ছোট, শুধু আমি অনেক বড়। পক্ষান্তরে নিচের লোকজনও পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়ানো লোকটিকে আকারে ছোট দেখতে পাবে। তেমনিভাবে অহংকারী ব্যক্তি মনে করে, দুনিয়ার সবাই ছোট, শুধু আমি বড়।

অথচ অন্যদের দৃষ্টিতে সে তুচ্ছ হয়ে ধরা পড়ে। যদিও মানুষ তার প্রভাব-প্রতিপত্তির ভয়ে তার সামনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, মুখে কিছুই বলে না। কিন্তু মনে মনে তার প্রতি বিরক্ত থাকে। অহংকারী নিজে বুঝতেই পারে না যে, আমি ভয়ানক এক রোগে আক্রান্ত।

অহংকার এক ভয়াবহ রোগঃ

অহংকার বড় ভয়ানক ব্যাধি। এই ব্যাধি থেকে আরো অনেক রোগ সৃষ্টি হয়। ক্রোধ, হিংসা-বিদ্বেষ, অত্যাচার ইত্যাদি সবকিছুর মূলে অহংকার। অথচ অহংকারী নিজে তা অনুভব করে না। এখন এই রোগ চিহ্নিত করে এর চিকিৎসা কে করবে? এজন্যই শায়খের দরকার। এটাই পীর-মুরিদির আসল প্রয়োজন এজন্যই।

টাখনুর নিচে পোশাক পরাঃ

হাদীস শরীফে এসেছে, টাখনুর নিচে পোশাক পরিধানকারী জাহান্নামী হবে। অনেকেই বলে থাকেন যে, অন্য হাদীসে এর কারণ হিসেবে অহংকারের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ অহংকারবশত টাখনুর নিচে পোশাক পরলে জাহান্নামে যেতে হবে, কিন্তু আমরা তো অহংকার করে পরি না। ফ্যাশন হিসেবে পরি। এতে তো কোনো দোষ নেই!

আমি তাদেরকে প্রশ্ন করি, ভাই! বলুন তো পৃথিবীতে এমন কে আছে, যে দৃঢ়তার সাথে বলতে পারে যে, আমার অন্তরে সামান্য অহংকারও নেই? নিশ্চয়ই নেই। তেমনিভাবে অন্যের ব্যাপারেও নিশ্চিতভাবে কেউ এ দাবি করতে পারে না যে, তার মনে বিন্দুমাত্র অহংকার নেই। শুধু দোজাহানের সর্দার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলা যাবে যে, তিনি সম্পূর্ণ অহংকারমুক্ত ছিলেন। অন্য কারো সম্পর্কেই একথা বলা যায় না। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো কখনো টাখনুর নিচে কাপড় পরেননি। তো আমাদের উচিত তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করা।

দ্বিতীয় কথা হল, এমন একজন অহংকারী খুঁজে বের করুন, যে তার অহংকারের কথা স্বীকার করে! তাহলে এ দাবি কীভাবে করা যায় যে, আমার মাঝে অহংকার নেই, তাই আমি টাখনুর নিচে পোশাক পরতে পারি?

অবশ্য কারো যদি ওযর বা অপারগতা থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। যেমন আবু বকর রা. সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর কাপড় আপনা আপনি নিচে ঝুলে পড়ত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরজ করলে তিনি তাঁর অপারগতা দেখে বললেন, অসুবিধা নেই, তুমি তো আর স্বেচ্ছায় অহংকারবশত করছ না।

যাহোক, যেভাবে রোগী নিজে তার দৈহিক রোগ-ব্যাধি নির্ণয় করতে পারে না, তাকে অভিজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয় তেমনিভাবে অন্তরেরও অনেক রোগ-ব্যাধি আছে, যা রোগী নিজে নির্ণয় করতে পারে না। যেমন হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, রিয়া, যশ-খ্যাতির লোভ, সম্পদের মোহ ইত্যাদি।

এই রোগ-ব্যাধি নির্ণয় ও নিরাময়ের জন্য বুযুর্গানে দ্বীনের শরণাপন্ন হতে হয়। তিনি এর চিকিৎসা করেন। কুরআন মজীদের ভাষায় একেই বলে তাযকিয়া। আর এটিই তাসাওউফের মূল কথা।

আগের যুগে মানুষ ইসলাহে নফসের জন্য কোনো বুযুর্গের শরণাপন্ন হলে মাসের পর মাস তার সাহচর্যে থেকে রিয়াযত-মোজাহাদা করতে হত। এ ধরনের বিভিন্ন ঘটনা আপনারাও হয়তো কিতাবপত্রে পড়েছেন। এখন এই যুগে যদি আমাকে-আপনাকে বলা হয়, অন্তরের ইসলাহের জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে খানকায় গিয়ে এত মাস পড়ে থাকতে হবে, কঠিন রিয়াযত-মুজাহাদা করতে হবে তাহলে আমাদের জন্য তা সম্ভব হবে না। তাই আমাদের দুর্বলতার কারণে বুযুর্গানে দ্বীন ইসলাহে নফসের এমন তরীকা বাতলে দিয়েছেন, যা আমরা সহজেই অনুসরণ করতে পারি। খুব বেশি মেহনতও করতে হয় না। আবার উদ্দেশ্যও অর্জিত হয়ে যায়।

আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তাআলার সাথে আমাদের তাআল্লুক যেন কায়েম হয়ে যায় এবং মজবুত হয়ে যায়। তাই হযরত হাকীমুল উম্মত রাহ. এমন কিছু সহজ 'নুসখা' বলে দিয়েছেন, যা ঠিকমতো মেনে চললে আগের যুগের দীর্ঘ মেহনত দ্বারা যা হাসিল হত এখন অল্প মেহনতেই তা

হাসিল হবে এবং আল্লাহ তাআলার সাথে তাআল্লুক মজবুত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম আমল : দুআ

অর্থাৎ আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং চাইতেই থাকা। এর একটি উপায় হল, জীবনের সকল কাজে মাসনূন দুআর ইহতিমাম করা। যেমন ঘুম থেকে উঠে দুআ পড়া, ইস্তিঞ্জাখানায় যেতে ও বের হতে দুআ পড়া, ফজরের সময় মসজিদে যেতে দুআ পড়া, ঘরে ঢুকতে ও বের হতে দুআ পড়া, খাবারের শুরুতে ও শেষে দুআ পড়া। মোটকথা, জীবনের প্রতিটি কাজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দুআ শিখিয়েছেন তা পাঠ করা। মানুষ একে সামান্য আমল মনে করে। আসলে তা অসামান্য আমল।

কারণ এ সকল দুআর মাঝে একটি দুআও যদি কবুল হয়ে যায় তাহলেও মানুষের জীবন সার্থক। যেমন মসজিদে প্রবেশ করার সময় পড়তে হয়-

اللهم افتح لي أبواب رحمتك

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের সকল দরজা খুলে দিন।

এই একটি দুআই যদি কবুল হয়ে যায় তাহলে আমার দুনিয়া-আখেরাতের কোন প্রয়োজনটি অপূর্ণ থাকবে?

ফজরের নামাযে মসজিদে যাওয়ার সময় পড়তে হয়,

اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا.

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর দান করুন। আমার দৃষ্টিতে নূর দান করুন। আমার ডানে-বায়ে, সামনে-পিছনে, উপরে-নিচে সবদিকে নূর দান করুন এবং আমাকে নূরে নূরান্বিত করুন।'

ভেবে দেখুন, এই দুআটি যদি কবুল হয়ে যায় তাহলে কল্যাণের আর কী বাকিথাকে?
মোটকথা, প্রতিটি মাসনূন দুআই এত গভীর অর্থবহ যে, একটি দুআও যদি কবুল হয়ে যায় তাহলে জীবনের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

মাসনূন দুআর দ্বিতীয় ফায়েদা হচ্ছে, এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার সাথে সার্বক্ষণিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সকল কাজে মাসনূন দুআর ইহতিমামের ফলে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। আমি উদাহরণ দিয়ে থাকি যে, আগে মানুষ সফরে গেলে পরিবারের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ থাকত না। এখন মোবাইল ফোন আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে মানুষ যেখানেই থাকুক, সর্বদা ঘরের সাথে, ছেলেমেয়ের সাথে তার যোগাযোগ থাকে। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সময় কাটাতে হয় না। তেমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে যেসব দুআ শিক্ষা দিয়েছেন তার দ্বারা আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দার সার্বক্ষণিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

এজন্য ভাই! মাসনূন দুআ কোনো মামুলি বিষয় নয়। এ এক অমূল্য সম্পদ। অজ্ঞতা ও উদাসীনতার কারণে মানুষ এই দুআগুলি মুখস্থও করে না। সময়মতো পড়ারও ইহতিমাম করে না। আরো আফসোসের কথা হচ্ছে, আমরা যারা তালিবে ইলম, হাদীসের কিতাবে এ দুআগুলো পড়ে থাকি, আমরাও খেয়াল করে এগুলো পড়ি না। আমাদের হযরত আরেফী রাহ. বলতেন-(মাসনূন দুআ তো আছেই) সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যত কাজ করতে হয় প্রত্যেক কাজের শুরুতে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ কর। ঘর থেকে বের হচ্ছ, মনে মনে দুআ কর-'আয় আল্লাহ! সহজে যানবাহনের ব্যবস্থা করে দাও।' বাহন পাওয়া গেল তো বল-'আল্লাহ! নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দাও।' রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম লেগে আছে, দুআ কর, 'হে আল্লাহ! রাস্তা পরিষ্কার করে দাও।' মোটকথা সকল কাজে সকল অবস্থায় আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ কর। সারাদিনই কোনো না কোনো কাজ থাকে। সকল কাজে আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে থাক। আল্লাহর দুয়ারের ভিখারী হয়ে যাও, তাঁর রহমতের কাঙাল বনে যাও এবং বারবার চাইতে থাক। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও আল্লাহ তাআলার কাছে চাও। এ নির্দেশনার মধ্য দিয়ে পেয়ারা নবী যেন উম্মতকে বললেন, ওহে মানুষ! তোমার তো অভাবের শেষ নেই, সব সময় কোনো না কোনো প্রয়োজন লেগেই থাকে।

অতএব সব সময় আল্লাহর কাছে চাইতে থাক। মাখলুকের সহায়তা নেওয়ার আগে খালিকের কাছে চাও। তিনিই তো প্রকৃত প্রয়োজন পূরণকারী।

হযরত আরেফী রাহ. আরো বলতেন, মুখে উচ্চারণ করে বলতে না পার, মনে মনে বল। আল্লাহ তো তোমার মনের খবরও জানেন। এভাবে সব সময় কিছু না কিছু চাইতে থাক। তারপর দেখ, জীবনে কেমন বরকত হয়।

দুআ করতে তো পয়সাকড়ি খরচ করতে হয় না। বাড়তি সময় লাগে না। কোনো পরিশ্রমও করতে হয় না। কত সহজ আমল!

অনেকে বলে, কত দুআ করব, দুআ তো কবুল হয় না। মনে রাখবেন, বান্দার প্রতিটি দুআই কবুল হয়। কোনো দুআই ব্যর্থ হয় না। প্রতিটি দুআর কমপক্ষে তিনটি ফায়েদা সম্পূর্ণ নিশ্চিত। এর মধ্যে দুটি তো সাথে সাথে পাওয়া যায়। প্রথম ফায়েদা হল, দুআ একটি ইবাদত। প্রার্থিত বস্তু পাওয়া যাক বা না যাক দুআর কারণে সাথে সাথে নেকি লেখা হয়। দুআর দ্বারা বান্দার আমলনামা ভারি হতে থাকে।

দ্বিতীয় ফায়েদা হচ্ছে, দুআর দ্বারা বান্দা আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী হয়। তৃতীয় ফায়েদা হল, বান্দার জন্য প্রার্থিত বিষয় যদি কল্যাণকর হয় তাহলে প্রার্থিত বস্তুই তাকে দান করা হয়। অন্যথায় এর বিনিময় আল্লাহ তাআলা তাকে অন্যভাবে দান করেন।

দেখুন, অবুঝ শিশু যদি ধারালো ছুরি নিয়ে খেলতে চায় তাহলে পিতামাতা তার ইচ্ছা পূরণ করেন না। সে যতই কান্নাকাটি করুক, বাবা-মা কখনোই তা দেন না। অন্য কিছু দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করেন। তেমনিভাবে বান্দা অনেক সময় না বুঝে অকল্যাণকর জিনিস চেয়ে বসে। কিন্তু মেহেরবান মালিক তা না দিয়ে অন্যভাবে তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

অতএব কোনো দুআই নিষ্ফল হয় না। এত বড় নেআমতকে মানুষ মামুলি মনে করে। ফলে এর বরকত থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। তাই মশক করে করে এর অভ্যাস গড়তে হবে।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রাহ. বলেন, যখনই কেউ আমার কাছে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করে, সাথে সাথে আমি আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু করি এবং মনে

মনে দুআ করি, আল্লাহ! এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমার অন্তরে দান কর। আল্লাহ তাআলার শোকর, কখনো এর অন্যথা হয় না।

দ্বিতীয় আমল : শোকর

দ্বিতীয় আমল হল, বেশি বেশি শোকরগোযারি করা। চিন্তা করে দেখুন, প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার কত অসংখ্য নেআমত আমাদের উপর বর্ষিত হচ্ছে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ তাআলার নেয়ামত। এগুলো সবল ও কর্মক্ষম থাকা কত বড় নেয়ামত! স্বাভাবিক অবস্থায় এই সব নেয়ামতের মূল্য না বুঝলেও যখন কোনো একটি অঙ্গ অসুস্থ বা অকেজো হয়ে পড়ে তখন তার মূল্য বুঝে আসে। ইমাম বায়হাকী রাহ. শুআবুল ঈমান কিতাবে এক বুযুর্গের ঘটনা লিখেছেন। বুযুর্গ মারাত্মক অসুস্থ ছিলেন এবং চলাফেরাতেও অক্ষম ছিলেন। হাত-পা অবশ হয়ে গিয়েছিল। সেই করুণ অবস্থাতেও শুয়ে শুয়ে বলছিলেন যে, 'হে আল্লাহ! তোমার শোকর, তোমার শোকর।' এক ব্যক্তি বলল, হযরত! এত অসুখের মাঝেও শুকরিয়া আদায় করছেন? তিনি বললেন, ভাই! আল্লাহ তাআলা তো আমার চোখ দুটো এখনও সুস্থ রেখেছেন। যদি এ দুটোও নষ্ট হয়ে যেত তাহলে আরো কত পেরেশানি হত!

খলীফা হারুনুর রশীদের একটি ঘটনা আছে। তিনি পিপাসার্ত হয়ে খাদেমের কাছে পানি চাইলেন। বিখ্যাত বুযুর্গ বাহলূল রাহ. খলীফার কাছেই ছিলেন। খলীফা পানি পান করতে যাবেন, এমন সময় বাহলূল বললেন, জনাব, একটু থামুন। আমার একটি প্রশ্ন আছে। খলীফা কিছুটা অবাক হয়ে পাত্র নামিয়ে নিলেন। বাহলূল বললেন, 'প্রচন্ড পিপাসার সময় এই এক পাত্র পানির জন্য আপনি কী পরিমাণ সম্পদ খরচ করতে রাজি হবেন?' একটু ভেবে খলীফা বললেন, 'পিপাসা যদি তীব্র হয়, প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে প্রয়োজনে আমার গোটা রাজত্ব দিয়ে হলেও এ পানিটুকু পেতে চাইব।

বাহলূল বললেন, ঠিক আছে। পান করুন।' খলীফা পানি পান করার পর বাহলূল আবার জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর, আরেকটি ছোট্ট প্রশ্ন আছে।' খলীফা বললেন, 'বলুন।' বাহলূল বললেন, 'আপনি যে পানিটুকু পান করলেন তা যদি আপনার

শরীরে আটকে থাকে (অর্থাৎ প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়) তাহলে তা বের করার জন্য কী পরিমাণ ব্যয় করবেন?'

খলীফা বললেন, 'এমন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে প্রয়োজনে আমার গোটা রাজত্ব দিয়ে দেব।' এবার বাহলূল বললেন, 'হুজুর! এই রাজত্বের কী মূল্য, যা এক পাত্র পানির পান করার জন্য এবং এক পাত্র পানি শরীর থেকে বের করার জন্য চলে যায়?!' অর্থাৎ এটি আল্লাহ তাআলার এত বড় নেয়ামত, এর মোকাবিলায় আপনার এই বিশাল রাজত্বও অতি তুচ্ছ।

বান্দা যদি তা চিন্তা করে তাহলে সে শোকরগোযারি করবে। তাই ইস্তিঞ্জা করার পরই এই দুআ পড়ার কথা আছে-

الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافني

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার ভিতর থেকে কষ্টদায়ক বস্তু বের করে দিয়েছেন এবং আমাকে আফিয়ত ও সুস্থতা দান করেছেন।

সুনানে দারাকুতনীর এক রেওয়ায়েতে দুআটি এভাবে আছে-

الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى علي قوته ودفع عني أذاه

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাকে খাবারের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন, আমার দেহে এর শক্তি ও উপকারিতা বাকি রেখেছেন এবং এর ক্ষতিকর অংশটুকু আমার ভিতর থেকে বের করে দিয়েছেন।

কত সুন্দর অর্থবহ দুআ!

এভাবে প্রতি মুহূর্তে মানুষ আল্লাহ তাআলার কত নেয়ামত ভোগ করছে! কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেন-

وقليل من عبادي الشكور .

আমার বান্দাদের মাঝে শোকরগোযার খুবই কম।

মোটকথা প্রয়োজনের শুরুতে দুআ আর প্রয়োজন পূরণ হলে শুকরিয়া, ইনশাআল্লাহ, খুব সহজ এ আমল দুটি পাবন্দির সাথে আদায় করলে দ্রুত আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জিত হবে।

আবার খুব সহজ হওয়ার কারণে দেখবেন, এখান থেকে উঠেই ভুলে যাচ্ছেন। গাফলত এসে যাচ্ছে। এই গাফলত দূর করার উপায় হল আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত। সোহবতের বরকতে আমলের তাওফীক হয়।

আর শোকর এমন এক দামি আমল, যে বান্দা যত বেশি শোকর আদায় করবে তত বেশি শয়তানের হামলা থেকে বেঁচে যাবে। শয়তান জান্নাত থেকে বহিষ্কার হওয়ার সময় পণ করেছিল, আদমসন্তানকে সবদিক থেকে গোমরাহ করার চেষ্টা চালাবে। তখন একথাও বলেছিল-

ولا تجد اكثرهم شاكرين

তাদের অধিকাংশকেই শোকরগোযার পাবেন না।

বুঝা গেল, শয়তানের অনেক বড় একটি হামলা হল, বান্দাকে শোকরগোযারি থেকে বিরত রেখে নাশোকরিতে লিপ্ত করে দেওয়া।

আর বান্দার অন্তরে যখন আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের কদর সৃষ্টি হয় তখন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাও সহজ হয়ে যায়। এভাবে ধীরে ধীরে আল্লাহ তাআলার সাথে তাআল্লুক বাড়তে থাকে।

তাকওয়া অর্জনের দ্বিতীয় উপায় হল, মুজাহাদা। মুজাহাদা ও জিহাদের শাব্দিক অর্থ সর্বাত্মক চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা।

আর সশস্ত্র জিহাদ শরীয়তের হুকুম-আহকাম মোতাবেক হলে তা অনেক বড় ইবাদত। আরেক ধরনের জিহাদ হল, যার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

المجاهد من جاهد نفسه

আপন নফসের সাথে যে জিহাদ করে, সে-ই মুজাহিদ। অর্থাৎ প্রবৃত্তির কামনার বিরুদ্ধে কাজ করা। একে বড় জিহাদ বলেও অভিহিত করা হয়েছে। হাদীসের

সনদে যদিও কিছুটা কালাম আছে, কিন্তু বুযুর্গ ও ফকীহগণ একে জিহাদে আকবর বলেছেন। মনে চাচ্ছে না মসজিদে যেতে, মনের বিরুদ্ধাচরণ করে মসজিদে চলে যেতে হবে। গুনাহ ছাড়তে মনে চাচ্ছে না, তারপরও জোর করে ছাড়তে হবে। হযরত থানভী রাহ. বলেন, অল্প কথায় তাসাওউফের সারমর্ম হল, কোনো ইবাদত পালনে অলসতা লাগলে জোর করে তা আদায় করা। আর গুনাহ থেকে বাঁচতে অনীহা বোধ করলে নিজের ওপর জোর খাটিয়ে তা থেকে বাঁচা। কে বলেছেন এই কথা? হাকীমুল উম্মত। যিনি তাসাওউফের মুজাদ্দিদ, যাঁর সারা জীবন এই পথেই কেটেছে। তিনি আরো বলেন, এই গুণ যার অর্জিত হয়েছে, তার অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। এর মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এর কারণেই সম্পর্কে উন্নতি ঘটে এবং এর মাধ্যমেই তা স্থায়ী থাকে। আর সবকাজে মনমতো চলা মানুষের প্রকৃতি নয়। বলুন দেখি, এমন কেউ আছে, যার সবকাজ মনমতো হয়? কখনোই অনাকাঙ্খিত কিছুর সম্মুখীন হতে হয় না? যত বড় সম্পদশালী, পুঁজিপতি বা ক্ষমতাশালী হোক না কেন, এ দাবি করতে পারবে না যে, আমি যা চাই, তাই হয়। কামনা-বাসনা কখনো কখনো বিসর্জন দিতেই হয়। এই বিসর্জন যদি আল্লাহ তাআলার পছন্দ মোতাবেক হয়, তাহলেই তা বান্দার জন্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের কারণ হয়। তাই নিজের ওপর জোর খাটিয়ে মনের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলার হুকুম মেনে চলতে হবে। এই চিকিৎসা ছাড়া অলসতার আর কোনা চিকিৎসা নেই। আল্লাহ তাআলা নিজ মেহেরবানিতে আমাদের সবাইকে এ আয়াতের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩৫৭

মুসলিম জীবনের আদব-কায়দা

Hazi Shariyatullah

Senior Member

০৮-০৬-২০১৫

মুসলিম জীবনের আদব-কায়দা

লেখক: ড. মো: আমিনুল ইসলাম |

আদব-কায়দা'র পরিচয়, গুরুত্ব ও তাৎপর্য

১. আদব-কায়দা'র পরিচয়:

আদব শব্দটি আরবি " أدب "শব্দ থেকে বাংলা ভাষায় বহুল ব্যবহৃত ও প্রচলিত শব্দ; যার অর্থ হলো: বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা, সভ্যতা, কৃষ্টি, সুশিক্ষা, নৈতিকতা, মানবিকতা, শোভনতা, শিষ্টাচার।[১] আবার " أدب "শব্দের অর্থ: নিয়মনীতি, পদ্ধতি ইত্যাদি। আর আদব-কায়দা মানে— ভদ্র সমাজের রীতি-পদ্ধতি; ভদ্র ব্যবহার। অন্যভাবে বলা যায়: আদব-কায়দা মানে কাঙ্খিত শিক্ষা, সভ্যতা ও মার্জিত সংস্কৃতির দ্বারা আত্মগঠনের অনুশীলন করা।[২]

ইবনু হাজার 'আসকালানী রহ. বলেন:

الأدب: استعمال ما يحمد قولاً وفعلاً

"কথায় ও কাজে প্রশংসনীয় ব্যবহারকে আদব বলে।"[৩]

আবার কেউ বলেন:

«الأخذ بمكارم الأخلاق.»

"উত্তম চরিত্র লালন করাকে আদব বলে।"[৪]

আবার কেউ কেউ বলেন:

»هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك.«

“আদব হলো উর্ধ্বতন ব্যক্তিকে সম্মান করা এবং অধস্তনকে স্নেহ করা।”[৫]

কেউ কেউ বলেন:

»الأدب هو حسن الأخلاق وفعل المكارم.«

“আদব মানে উত্তম চরিত্র এবং ভালো কাজ।”[৬]

আর ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন:

»الأدب اجتماع خصال الخير في العبد.«

“বান্দার মধ্যে উত্তম বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটানোকে আদব বলে।”[৭]

আবার কেউ কেউ বলেন:

»والأدب هو الخصال الحميدة.«

“প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহকেই আদব বলে।”[৮]

আর আমাদের দেশীয় ভাষায় বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা, সভ্যতা, কৃষ্টি, সুশিক্ষা, নৈতিকতা, মানবিকতা, শোভনতা ইত্যাদি গুণাবলী যে ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাকে ‘মুয়াদ্দাব’ (শালীন, ভদ্র ও সুশিক্ষিত) বলে। আর এসব গুণাবলী যার মধ্যে বিদ্যমান নেই, তাকে ‘বেয়াদব’ (অশালীন, অভদ্র, অসভ্য) বলে।

২. আদব-কায়দা’র গুরুত্ব ও তাৎপর্য:

মানবজীবন তথা মুসলিম ব্যক্তির জীবনে আদব-কায়দার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহুল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

»إِنَّ الْهَدْىَ الصَّالِحَ ، وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ ، وَالاقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ « . (رواه أبو داود.(

“নিশ্চয়ই উত্তম চরিত্র, ভালো ব্যবহার ও পরিমিত ব্যয় বা মধ্যপন্থা অবলম্বন করা নবুয়্যাতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ সমতুল্য।”[৯]

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন:

» أُطْلُبْ الْأَدَبَ فَإِنَّهُ زِيَادَةٌ فِي الْعَقْلِ ، وَدَلِيلٌ عَلَى الْمُرُوءَةِ ، مُؤْنِسٌ فِي الْوَحْدَةِ ، وَصَاحِبٌ فِي الْغُرْبَةِ ، وَمَالٌ عِنْدَ الْقِلَّةِ » . (ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِهِ.(

“তুমি আদব অন্বেষণ কর; কারণ, আদব হলো বুদ্ধির পরিপূরক, ব্যক্তিত্বের দলীল, নিঃসঙ্গতায় ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রবাসজীবনের সাথী এবং অভাবের সময়ে সম্পদ।”[১০]

আর আদব বা শিষ্টাচার এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার দ্বারা ব্যক্তির জীবন পরিশুদ্ধ ও পরিপাটি হয়; আর এ আদব হলো দীন ইসলামের সারবস্তু; সুতরাং মুসলিম ব্যক্তির জন্য জরুরি হলো আল্লাহ তা‘আলার সাথে, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এবং সাধরণ মানুষসহ সকল সৃষ্টির সাথে আদব রক্ষা করে চলা; আর এ আদবের মাধ্যমেই একজন মুসলিম জানতে পারবে তার খাবার ও পানীয় গ্রহণের সময় তার অবস্থা কেমন হওয়া উচিৎ; কিভাবে তার সালাম প্রদান, অনুমতি গ্রহণ, বসা, কথা বলা, আনন্দ ও শোক প্রকাশ করা, হাঁচি দেওয়া ও হাই তোলার মত বিবিধ কাজ সম্পন্ন হবে; আর কেমন ব্যবহার হবে তার পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে। এক কথায় এ আদব-কায়দা রক্ষা করে চলার মাধ্যমেই একজন মুসলিম কাঙ্খিত মানের ভদ্র ও সভ্য মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং নিজেকে অন্যান্য জাতির চেয়ে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে; ফলে দীন ইসলামের সৌন্দর্য ছড়িয়ে যাবে সমাজ, রাষ্ট্র ও দুনিয়ার দিক দিগন্তে। তাইতো কেউ কেউ শিক্ষার চেয়ে আদব বা শিষ্টাচারের বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন; ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

»تَأَدَّبُوا ثُمَّ تَعَلَّمُوا. «

“তোমরা আগে সুসভ্য হও, তারপর জ্ঞান অর্জন কর।”[১১]

আল-কারাফী তাঁর ‘আল-ফারুক’ গ্রন্থে বলেন:

»وَاعْلَمْ أَنَّ قَلِيلَ الْأَدَبِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْعَمَلِ. «

“আর জেনে রাখবে, অনেক বেশি কাজের চেয়ে অল্প আদব অনেক বেশি উত্তম।”[১২]

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন:

»لَا يَنْبُلُ الرَّجُلُ بِنَوْعٍ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَمْ يُزَيِّنْ عِلْمَهُ بِالْأَدَبِ. «

“ব্যক্তি কোনো প্রকার জ্ঞান দ্বারা মহৎ হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার জ্ঞানকে আদব দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করবে।”[১৩]

তিনি আরও বলেন:

»نَحْنُ إِلَى قَلِيلٍ مِنْ الْأَدَبِ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَى كَثِيرٍ مِنْ الْعِلْمِ. «

“আমরা অনেক বেশি জ্ঞানের চেয়ে কম আদবকে অনেক বেশি জরুরি বা প্রয়োজন মনে করতাম।”[১৪]

কোনো কোনো দার্শনিক বলেন:

»لَا أَدَبَ إِلَّا بِعَقْلٍ ، وَلَا عَقْلَ إِلَّا بِأَدَبٍ. «

“আকল (বুদ্ধি) ছাড়া আদব হয় না; আবার আদব ছাড়া আকলও হয় না।”[১৫] অর্থাৎ একটি আরেকটির পূরিপূরক।

আর জনৈক সৎব্যক্তি তার ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

»اجْعَلْ عَمَلَك مِلْحًا وَأَدَبَك دَقِيقًا. «

“তুমি তোমার আমলকে মনে করবে লবণ, আর তোমার আদবকে মনে করবে ময়দা।”[১৬]
অর্থাৎ তুমি আমলের চেয়ে আদবকে এত বেশি গুরুত্ব দিবে, লবণ ও ময়দার স্বাভাবিক মিশ্রণে উভয়ের অনুপাত যেভাবে কম বেশি হয়।

==========

[১] ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, আল মুনীর আরবী-বাংলা অভিধান, দারুল

হিকমা বাংলাদেশ, প্রকাশকাল: জুলাই ২০১০ খ্রি., পৃ. ১৫; বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পরিমার্জিত সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ১০৩

[২] আল-মু'জাম আল-অসীত, দ্র: " **أدب** "

[৩] 'মাউসু'য়াতুল বাহুছ ওয়াল মাকালাতুল 'ইলমিয়্যা' (**موسوعة البحوث و المقالات العلمية**), পৃ. ১ (আল-মাকতাবা আশ-শামেলা, আল-ইসদার আস-সানী)। "

[৪] প্রাগুক্ত।

[৫] প্রাগুক্ত।

[৬] প্রাগুক্ত।

[৭] প্রাগুক্ত।

[৮] প্রাগুক্ত।

[৯] আবূ দাউদ, হাদিস নং- ৪৭৭৮; আলবানী হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন।

[১০] হাকেম রহ. তাঁর 'আত-তারীখ' গ্রন্থে বর্ণনটি উল্লেখ করেছেন।

[১১] উদ্ধৃত, গিযাউল আলবাব (**غذاء الألباب**), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫ (আল-মাকতাবা আশ-শামেলা, আল-ইসদার আস-সানী)। "

[১২] উদ্ধৃত, 'মাউসু'য়াতুল বাহুছ ওয়াল মাকালাতুল 'ইলমিয়্যা' (**موسوعة البحوث و المقالات العلمية**), পৃ. ১ (আল-মাকতাবা আশ-শামেলা, আল-ইসদার আস-সানী)। "

[১৩] উদ্ধৃত, গিযাউল আলবাব (**غذاء الألباب**), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫ (আল-মাকতাবা আশ-শামেলা, আল-ইসদার আস-সানী)। "

[১৪] উদ্ধৃত, 'মাউসু'য়াতুল বাহুছ ওয়াল মাকালাতুল 'ইলমিয়্যা' (**موسوعة البحوث و المقالات العلمية**), পৃ. ১ (আল-মাকতাবা আশ-শামেলা, আল-ইসদার আস-সানী)। "

[১৫] উদ্ধৃত, গিযাউল আলবাব (**غذاء الألباب**), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫ (আল-মাকতাবা আশ-শামেলা, আল-ইসদার আস-সানী)। "

[১৬] উদ্ধৃত, 'মাউসু'য়াতুল বাহুছ ওয়াল মাকালাতুল 'ইলমিয়্যা' (**موسوعة البحوث و المقالات العلمية**), পৃ. ১ (আল-মাকতাবা আশ-শামেলা, আল-ইসদার আস-সানী)। "

মুসলিম জীবনের আদব-কায়দা পর্ব -২

নিয়তের আদবসমূহ

মুসলিম ব্যক্তি নিয়তের মর্যাদা ও প্রভাবের প্রতি বিশ্বাস করে এবং আরও বিশ্বাস করে তার ধর্মীয় ও জাগতিক জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের জন্য নিয়তের গুরুত্বকে। কারণ, নিয়তের দ্বারাই সকল কাজের অস্তিত্ব লাভ করে এবং নিয়ত অনুযায়ীই তার রূপ-প্রকৃতি তৈরি হয়; ফলে সে অনুসারে তা শক্তিশালী হয়, দুর্বল হয়, শুদ্ধ হয় এবং নষ্ট হয়; আর মুসলিম ব্যক্তি প্রত্যেক কাজে নিয়তের প্রয়োজনীয়তা ও তা বিশুদ্ধকরণের আবশ্যকতার বিষয়টিকেও বিশ্বাস করে। এ ব্যাপারে সে প্রথমত আল্লাহর বাণী থেকে দলীল গ্রহণ করে;

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

]وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ [البينة: ٥

"আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে।"**[১]**

আল্লাহ সুবহানহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন:

]قُلۡ إِنِّيٓ أُمِرۡتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ]الزمر: ١١

"বলুন, 'আমি তো আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি, আল্লাহ*র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর 'ইবাদাত করতে।"**[২]**

আর দ্বিতীয়ত দলীল গ্রহণ করে মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী থেকে, তিনি বলেন:

)إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (.متفق عليه

“প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত; আর প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে।”[৩]

তিনি আরও বলেন:

)إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ)رواه مسلم

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের চেহারা ও সম্পদের দিকে তাকান না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কর্মের দিকে লক্ষ্য করেন।”[৪]

আর অন্তরের দিকে লক্ষ্য করা মানে নিয়তের দিকে লক্ষ্য করা; কেননা, নিয়ত হলো কাজের উদ্দেশ্য ও প্রতিরক্ষক। অপর এক হাদিসে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

)مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ)رواه مسلم

“যে ব্যক্তি ভালোকাজের পরিকল্পনা করল, কিন্তু বাস্তবে সে কাজ করতে পারল না, সে ব্যক্তির জন্য সাওয়াব লেখা হবে।”[৫]

সুতরাং শুধু ভালোকাজের পরিকল্পনা করার দ্বারাই কাজটি ভালোকাজ হিসেবে গণ্য হয়ে যায়, প্রতিদান সাব্যস্ত হয়, সাওয়াব অর্জন হয়; আর এটা শুধু ভালো নিয়তের ফযীলতের করণেই সম্ভব হয়।

অপর এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَثَلِ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا ، فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا ، فَهُوَ يَقُولُ : لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ . وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا ، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ عِلْمًا وَلَا مَالًا ، فَهُوَ يَقُولُ : لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ)رواه ابن ماجه

“এ উম্মতের দৃষ্টান্ত চার ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মত: ১. এক ব্যক্তি হলো আল্লাহ তাকে সম্পদ ও ‘ইলম (জ্ঞান) দান করেছেন, অতঃপর সে তার জ্ঞান দ্বারা আমল করে তার সম্পদকে হক পথে খরচ করে; ২. আরেক ব্যক্তি হলো আল্লাহ তাকে ‘ইলম দান করেছেন, কিন্তু তাকে সম্পদ দেননি, অতঃপর সে বলে: আমার যদি এ ব্যক্তির মত সম্পদ থাকত, তাহলে আমি সে ক্ষেত্রে সে ব্যক্তির মতই কাজ করতাম; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: সাওয়াবের ক্ষেত্রে তারা উভয়ে সমান। ৩. অপর আরেক ব্যক্তি হলো আল্লাহ তাকে সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু তাকে ‘ইলম দেননি, অতঃপর সে তার সম্পদের ক্ষেত্রে এলোমেলোভাবে কাজ করে তা অন্যায় পথে খরচ করে; ৪. অপর আরেক ব্যক্তি হলো আল্লাহ তাকে সম্পদ ও ‘ইলম কোনটিই দান করেননি, অতঃপর সে বলে: আমার যদি এ ব্যক্তির মত সম্পদ থাকত, তাহলে আমি সে ক্ষেত্রে সে ব্যক্তির মতই কাজ করতাম; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: গুনাহের ক্ষেত্রে তারা উভয়ে সমান।”[৬]

সুতরাং ভালো নিয়তকারী ব্যক্তিকে ভালোকাজের সাওয়াব দেওয়া হয়; আর মন্দ নিয়তকারী ব্যক্তিকে মন্দকাজের মন্দ প্রতিদান দেওয়া হয়; আর এর একমাত্র কারণ হল নিয়ত।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধের সময় তাবুকে অবস্থান কালে বলেন:

لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا ، وَلاَ أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ ، وَلاَ قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلاَّ وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ ». قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ

بِالْمَدِينَةِ ؟ فَقَالَ : حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ فَشَرَكُوا بِحُسْنِ النيةِ – رواه أبو داود و البخاري

“তোমরা মদীনাতে এমন সম্প্রদায়কে রেখে এসেছ, যারা কোনো দূরপথ ভ্রমণ করেনি, কোনো অর্থ-সম্পদ খরচ করেনি এবং কোনো উপত্যকাও অতিক্রম করেনি, তবুও তারা তোমাদের সাথে (সাওয়াবে) শরীক রয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম রা. নিবেদন করলেন: তারা কিভাবে আমাদের সাথে সাওয়াবের অংশীদার হবে, অথচ তারা মদীনাতেই ছিল? তখন তিনি বললেন: ‘ওযর’ তাদেরকে আটকিয়ে রেখেছিল। (তারা ভালো নিয়তের মাধ্যেমে আমাদের সাথে শরীক হয়েছে)।”[৭]

সুতরাং ভালো নিয়তের কারণে গাযী না হয়েও গাযীর মত সাওয়াবে অংশীদার হবে, আর মুজাহিদ না হয়েও মুজাহিদের মত সাওয়াব পাবে। অপর এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّارِ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَذَا الْقَاتِلُ ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ) :متفق عليه

“যখন দু’জন মুসলিম তাদের তরবারি নিয়ে মুখোমুখি হবে, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামে যাবে। প্রশ্ন করা হল: হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এ হত্যাকারী (তো অপরাধী), কিন্তু নিহত ব্যক্তির কী অপরাধ? তখন তিনি বললেন: কারণ, সে তার সঙ্গীকে হত্যা করার ইচ্ছা (নিয়ত) করেছিল।”[৮]

সুতরাং হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির মাঝে জাহান্নাম আবশ্যক হওয়ার বিষয়টিকে সমান করে দিল তাদের উভয়ের মন্দ নিয়ত ও খারাপ উদ্দেশ্য। তার নিয়ত যদি খারাপ না হত, তাহলে সে জান্নাতের অধিবাসী হত।

অন্য এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

)من تَزوَّج بصدَاقٍ لا يَنْوِي أداءَهُ فهو زَانٍ ، و من أدَانَ دَيْناً و هو لا يَنْوِي قَضَاءَهُ فهو سارقٌ) رواه أحمد و ابن ماجه)

“যে ব্যক্তি এমন পরিমাণ মোহরের বিনিময়ে বিয়ে করেছে, যা সে পরিশোধ করার নিয়ত নেই, সে ব্যক্তি ব্যভিচারী; আর যে ব্যক্তি এমন ঋণ গ্রহণ করেছে, যা তার পরিশোধ করার ইচ্ছা নেই, সে ব্যক্তি চোর।”[৯]

সুতরাং মন্দ নিয়ত বৈধ জিনিসকে হারামে রূপান্তরিত করল এবং জায়েয বিষয়কে নিষিদ্ধ বস্তুতে পরিণত করল; আর যা সমস্যামুক্ত ছিল, তা সমস্যাযুক্ত হয়ে গেল।

এ সব কিছুই মুসলিম ব্যক্তি যে নিয়তের মর্যাদা ও প্রভাব এবং তার বড় ধরনের গুরুত্বের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও নিবিড় আস্থা পোষণ করে, সে বিষয়টিকে আরও মজবুত করে; ফলে সে বিশুদ্ধ নিয়তের উপর তার সকল কর্মকাণ্ডের ভিত রচনা করে; ঠিক অনুরূপভাবে সে সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা করে যাতে তার একটি কাজও নিয়ত ছাড়া বা বিশুদ্ধ নিয়ত ছাড়া সংঘটিত না হয়; কারণ, নিয়ত হলো কর্মের প্রাণ ও ভিত্তি; সুতরাং নিয়ত সঠিক তো কাজও সঠিক, আর নিয়ত শুদ্ধ নয় তো কাজও শুদ্ধ নয়; আর কর্তার বিশুদ্ধ নিয়ত ব্যতীত কাজ হলো মোনাফেকী, কৃত্রিম, নিন্দিত ও ঘৃণিত।

আর অনুরূপভাবে মুসলিম ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আমলসমূহ বিশুদ্ধ হওয়ার অন্যতম রুকন ও শর্ত হলো নিয়ত; তারপর সে মনে করে যে, নিয়ত শুধু মুখে (হে আল্লাহ! আমি এরূপ নিয়ত করেছি) উচ্চারণ করার নাম নয়, আবার নিয়ত বলতে শুধু মনের ভাবকেই বুঝায় না, বরং নিয়ত হলো সঠিক উদ্দেশ্যে— উপকার হাসিল বা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য যথাযথ কাজের প্রতি মনের ঝোঁক বা জাগরণ এবং অনুরূপভাবে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অথবা তাঁর নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে কাজের প্রতি মনোযোগ দেওয়া।

আর মুসলিম ব্যক্তি যখন বিশ্বাস করে যে, ভালো নিয়তের কারণে বৈধ কাজ প্রতিদান ও সাওয়াবের উপযুক্ত আনুগত্যে পরিণত হয় এবং বিশুদ্ধ নিয়তের অভাবে সাওয়াবের কাজও গুনাহ্ ও শাস্তির উপযুক্ত অন্যায় ও অবাধ্যতায় পরিণত হয়, তখন সে মনে করে না যে, অন্যায় ও অবাধ্যতার ক্ষেত্রে ভালো নিয়তের ফলে তা সাওয়াবের কাজে পরিণত হয়; সুতরাং যিনি কোনো ব্যক্তির গিবত করবেন অপর কোনো ব্যক্তির মন ভালো করার জন্য, তিনি এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা‘আলার অবাধ্য ও পাপী বলে বিবেচিত হবেন, তার তথা কথিত ভালো নিয়ত এখানে তার কোনো উপকারে আসবে না; আর যে ব্যক্তি হারাম অর্থ দ্বারা মাসজিদ নির্মাণ

করবে, তাকে এ কাজের জন্য সাওয়াব দেয়া হবে না; আর যে ব্যক্তি নাচ-গান ও রঙ্গ-তামাশার অনুষ্ঠানে হাজির হয় জিহাদ ও অনুরূপ কোনো কাজে উৎসাহ পাওয়ার জন্য অথবা লটারীর টিকেট ক্রয় করে কল্যাণমূলক কাজে উৎসাহিত করার নিয়তে, সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য ও পাপী বলে বিবেচিত হবে এবং সাওয়াব পাওয়ার পরিবর্তে গুনাহগার হবে; আর যে ব্যক্তি সৎ ব্যক্তিগণের প্রতি ভালোবাসার নিয়তে তাদের কবরের উপর গম্বুজ তৈরি করবে অথবা তাদের উদ্দেশ্যে পশু যবাই করবে অথবা তাদের জন্য মানত করবে, সে ব্যক্তিও তার এ কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য ও পাপী বলে বিবেচিত হবে, যদিও তার ধারণা মতে তার নিয়তটি ভালো হয়ে থাকে; কারণ, অনুমোদিত 'মুবাহ' (বৈধ) কাজের ক্ষেত্রে ছাড়া অন্য কোনো কাজই সৎ নিয়তের কারণে সাওয়াবের কাজ বলে গণ্য হবে না; আর হারাম কাজ তো কোনো অবস্থাতেই সাওয়াবের কাজে রূপান্তরিত হবে না।[১০]

---

[১] সূরা আল-বায়্যেনা, আয়াত: ৫

[২] সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১১

[৩] বুখারী, হাদিস নং- ১; মুসলিম, হাদিস নং- ৫০৩৬

[৪] মুসলিম, হাদিস নং- ৬৭০৮

[৫] মুসলিম, হাদিস নং- ৩৫৪

[৬] ইবনু মাজাহ, হাদিস নং- ৪২২৮; তিনি হাদিসটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।

[৭] আবূ দাউদ, হাদিস নং- ২৫১০; বুখারী, হাদিস নং- ৪১৬১

[৮] বুখারী, হাদিস নং- ৩১ ও ৬৬৭২; মুসলিম, হাদিস নং- ৭৪৩৪

[৯] হাদসটি ইমাম আহমাদ ও ইবনু মাজাহ রহ. বর্ণনা করেছেন এবং ইবনু মাজাহ রহ. 'মোহর'-এর বিষয়টিকে বাদ দিয়ে শুধু 'ঋণ'-এর বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বর্ণনা করেছেন।

[১০] আবূ বকর আল-জাযায়েরী, মিনহাজুল মুসলিম, দারুশ্ শুরুক, জেদ্দা, চতুর্থ সংস্করণ, দশম মুদ্রণ: ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ. ১০৩

মুসলিম জীবনের আদব-কায়দা পর্ব -৩

আল্লাহ তা'আলার সাথে মুসলিম বান্দার আদব

মুসলিম ব্যক্তি তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার অগণিত নি'য়ামতের প্রতি লক্ষ্য করে; আরও লক্ষ্য করে ঐসব নি'য়ামতের প্রতি, যেসব নি'য়ামত তার মায়ের গর্ভে থাকাকালীন সময় থেকে শুরু করে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ (মৃত্যু) করা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে তাকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। ফলে সে তার নিজ মুখে তাঁর যথাযথ প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার দ্বারা এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে তাঁর আনুগত্যের অধীনস্থ করে দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করে; আর এটাই হলো তার পক্ষ থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে আদব; কেননা, নি'য়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহকে অস্বীকার করা, তাকে এবং তার ইহসান ও অবদানকে অবজ্ঞা করাটা কোনো আদব বা শিষ্টাচরের মধ্যে পড়ে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

[وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ] [النحل: ٥٣]

"তোমাদের নিকট যেসব নিয়ামত রয়েছে, তা তো আল্লাহর নিকট থেকেই (এসেছে)।"[১]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

[وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ] [النحل: ١٨]

"তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।"[২]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

[فَٱذْكُرُونِيٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ] [البقرة: ١٥٢]

“কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না।”[৩]

আর মুসলিম ব্যক্তি গভীরভাবে লক্ষ্য করে যে, আল্লাহ তা‘আলা তার সম্পর্কে জানেন এবং তার সকল অবস্থা অবলোকন করেন; ফলে তার হৃদয়-মন তাঁর ভয়ে ও তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে; যার কারণে সে তাঁর অবাধ্যতায় লজ্জিত হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ও তাঁর আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাওয়াটাকে রীতিমত অপমান মনে করে। সুতরাং এটাও তার পক্ষ থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার সাথে আদব; কেননা, গোলাম কর্তৃক তাঁর মালিকের সাথে অবাধ্য আচরণ করা অথবা মন্দ ও ঘৃণ্য কোনো বস্তু বা বিষয় নিয়ে তাঁর মুখোমুখি হওয়া, অথচ তিনি তা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন— তা কোনো ভাবেই আদব বা শিষ্টাচরের মধ্যে পড়ে না।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

]مَّا لَكُمۡ لَا تَرۡجُونَ لِلَّهِ وَقَارٗ، وَقَدۡ خَلَقَكُمۡ أَطۡوَارًا] [نوح: ١٣، ١٤]

“তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহ*র শ্রেষ্ঠত্বের পরওয়া করছ না। অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।”[৪]

তিনি আরও বলেন:

]وَيَعۡلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعۡلِنُونَۚ] [التغابن: ٤]

“আর তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর।”[৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

وَمَا تَكُونُ فِي شَأۡنٖ وَمَا تَتۡلُواْ مِنۡهُ مِن قُرۡءَانٖ وَلَا تَعۡمَلُونَ مِنۡ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيۡكُمۡ شُهُودًا إِذۡ تُفِيضُونَ فِيهِۚ وَمَا يَعۡزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثۡقَالِ ذَرَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ (يونس: ٦١]

“আর আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন এবং আপনি সে সম্পর্কে কুরআন থেকে যা-ই তিলাওয়াত করেন এবং তোমরা যে আমলই কর না কেন, আমরা

তোমাদের সাক্ষী থাকি- যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। আর আসমানসমূহ ও যমীনের অণু পরিমাণও আপনার রবের দৃষ্টির বাইরে নয়।"[৬]

আবার মুসলিম ব্যক্তি গভীরভাবে এটাও লক্ষ্য করে যে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর ক্ষমতাবান, সে তাঁর আয়াত্তাধীন এবং তাঁর দিকে ছাড়া তার পালানোর, মুক্তির ও আশ্রয় নেয়ার আর কোনো জায়গা নেই; সুতরাং সে আল্লাহর দিকে ধাবিত হবে, তাঁর সামনে নিজেকে সমর্পণ করে দেবে, তার বিষয়াদি তাঁর নিকট সোপর্দ করবে এবং তাঁর উপর ভরসা করবে; ফলে এটা তার পক্ষ থেকে তার প্রতিপালক ও সৃষ্টা আল্লাহ তা'আলার সাথে আদব বলে গণ্য হবে; কেননা, যাঁর থেকে পালিয়ে বেড়ানোর কোনো সুযোগ নেই তাঁর কাছ থেকে পালানো, যার কোনো ক্ষমতা নেই তার উপর নির্ভর করা এবং যার কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই তার উপর ভরসা করা কোনো আদব বা শিষ্টাচারের মধ্যে পড়ে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

]مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُۢ بِنَاصِيَتِهَآ] [هود: ٥٦[

"এমন কোন জীব-জন্তু নেই, যে তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়।"[৭]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

]فَفِرُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۖ إِنِّي لَكُم مِّنۡهُ نَذِيرٞ مُّبِينٞ] [الذاريات: ٥٠[

"অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও, নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক স্পষ্ট সতর্ককারী।"[৮]

তিনি আরও বলেন:

]وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ] [المائدة: ٢٣[

"এবং আল্লাহর উপরই তোমরা নির্ভর কর, যদি তোমরা মুমিন হও।"[৯]

আবার মুসলিম ব্যক্তি এটাও গভীরভাবে লক্ষ্য করে যে, আল্লাহ তা'আলা তার সকল বিষয়ে তার প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তার প্রতি ও তাঁর (আল্লাহর) সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া ও করুণা করেন, যার কারণে সে এর চেয়ে আরও বেশি আশা করে; ফলে সে খালেসভাবে তাঁর নিকট অনুনয়, বিনয় ও নিবেদন করে এবং

ভালো কথা ও সৎ আমলের অছিলা ধরে তাঁর নিকট প্রার্থনা করে; সুতরাং এটা তার পক্ষ থেকে তার মাওলা আল্লাহ তা'আলার সাথে আদব বলে গণ্য হবে; কারণ, যে রহমত সকল কিছুকে বেষ্টন করে রেখেছে তার থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া, যে ইহসান সকল সৃষ্টিকে শামিল করে তার থেকে হতাশ বা নিরাশ হওয়া এবং যে দয়া ও অনুগ্রহ সকল সৃষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত করে তার আশা ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে কোনো আদব বা শিষ্টাচার নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:[١٥٦ :الاعراف] [وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ]
"আর আমার দয়া তো প্রত্যেক বস্তুকে ঘিরে রয়েছে।"[১০]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন: [١٩ الشورى] [اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ

"আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত কোমল।"[১১]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন: ٨٧ :يوسف] [وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ]
"এবং আল্লাহর রহমত হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না।"[১২]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন: [٥٣ :الزمر] [لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ]
"তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না।"[১৩]

আর মুসলিম ব্যক্তি এটাও গভীরভাবে লক্ষ্য করে যে, তার প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা'র ধরা বড় কঠিন, তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা রাখেন এবং তিনি খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী; ফলে সে তাঁর আনুগত্য করার মাধ্যমে তাঁকে ভয় করে এবং আত্মরক্ষা করে তাঁর অবাধ্য না হওয়ার মধ্য দিয়ে; ফলে এটাও আল্লাহ তা'আলার সাথে তার পক্ষ থেকে আদব বলে গণ্য হয়; কারণ, কোনো বুদ্ধিমানের নিকটই এটা আদব বলে গণ্য হবে না যে, একজন দুর্বল আক্ষম বান্দা মহাপরাক্রমশালী প্রবল শক্তিধর মহান 'রব' আল্লাহ তা'আলার মুখোমুখী হবে বা তাঁর বিরোধিতা করবে;
অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[وَإِذَآ أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ] [الرعد: ١١]

“আর কোনো সম্প্রদায়ের জন্য যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছে করেন, তবে তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক নেই।”[১৪]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন: [إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ] [البروج: ١٢]

“নিশ্চয় আপনার রবের পাকড়াও বড়ই কঠিন।”[১৫]

তিনি আরও বলেন: [وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ] [ال عمران ٤..:]

“আর আল্লাহ মহা-পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।”[১৬]

আর মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার অবাধ্য হওয়ার মুহূর্তে এবং তাঁর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাঁর প্রতি এমনভাবে লক্ষ্য করে যে, মনে হয় যেন আল্লাহর দেওয়া হুমকি তাকে পেয়ে বসেছে, তাঁর আযাব বুঝি তার প্রতি নাযিল হয়ে গেল এবং তাঁর শাস্তি যেন তার আঙ্গিনায় আপতিত হল; অনুরূপভাবে সে তাঁর আনুগত্য করার মুহূর্তে এবং তাঁর শরী‘য়তের অনুসরণ করার সময় তাঁর প্রতি এমনভাবে লক্ষ্য করে যে, মনে হয় যেন তিনি তাঁর দেয়া প্রতিশ্রুতি তার জন্য সত্যে পরিণত করে দিয়েছেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির চাদর খুলে তাকে ঢেকে দিয়েছেন; সুতরাং এটা হলো মুসলিম ব্যক্তির পক্ষ থেকে আল্লাহ তা‘আলার প্রতি সুধারণা বিশেষ; আর আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করাটা আদব বা শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত; কেননা, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক আল্লাহ তা‘আলার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করাটা কোনো ভাবেই আদবের মধ্যে পড়ে না; কারণ, সে তাঁর অবাধ্য হয়ে চলবে এবং তাঁর আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে, আর ধারণা করবে যে, তিনি তার ব্যাপারে অবগত নন এবং তিনি তাকে তার পাপের জন্য পাকড়াও করবেন না; অথচ তিনি বলেন:

وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ سورة فصلت

“বরং তোমরা মনে করেছিলে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। আর তোমাদের রব সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদের ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা হয়েছ ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।”[১৭]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার সাথে এটাও আদব নয় যে, বান্দা তাঁকে ভয় করবে ও তাঁর আনুগত্য করবে এবং ধারণা করবে যে, তিনি তাকে তার ভালো কাজের প্রতিদান দিবেন না এবং তার পক্ষ থেকে তিনি তাঁর আনুগত্য ও 'ইবাদতকে কবুল করবেন না; অথচ তিনি বলেন:

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾ سورة النور

"আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহলে তারাই কৃতকার্য।"[১৮]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

]مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ] [النحل: ٩٧]

"মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, তাকে আমি অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।"[১৯]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٦٠﴾ سورة الأنعام ۖ﴿

"কেউ কোনো সৎকাজ করলে সে তার দশ গুণ পাবে। আর কেউ কোনো অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু তার অনুরূপ প্রতিফলই দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।"[২০

.....

---

[১] সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৫৩ [২] সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১৮ [৩] সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫২ [৪] সূরা নূহ, আয়াত: ১৩ – ১৪ [৫] সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ৪ [৬] সূরা ইউনুস, আয়াত: ৬১ [৭] সূরা হুদ, আয়াত: ৫৬

[৮] সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫০ [৯] সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ২৩ [১০] সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৫৬ [১১] সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ১৯ [১২] সূরা ইউসূফ, আয়াত: ৮৭ [১৩] সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৩ [১৪] সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ১১ [১৫] সূরা আল-বুরূজ, আয়াত: ১২ [১৬] আলে ইমরান, আয়াত: ৪ [১৭] সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ২২ – ২৩ [১৮] সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫২ [১৯] সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৯৭ [২০] সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৬০

আর মূলকথা হলো:

মুসলিম ব্যক্তি কর্তৃক তার প্রতিপালকের দেয়া নি'য়ামতের জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করা, তাঁর অবাধ্যতার দিকে ধাবিত হওয়ার সময় তাঁকে লজ্জা পাওয়া, তাঁর কাছে সত্যিকার অর্থে তাওবা করা, তাঁর উপর ভরসা করা, তাঁর রহমতের প্রত্যাশা করা, তাঁর শাস্তিকে ভয় করা, তাঁর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে এবং তাঁর ইচ্ছা মাফিক তাঁর কোনো বান্দার প্রতি শাস্তিমূলক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ব্যাপারে তাঁর প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করাটাই হলো আল্লাহ তা'আলার সাথে তার আদব রক্ষা করে চলা; আর বান্দা কর্তৃক এ আদবের যতটুকু ধারণ ও রক্ষা করে চলবে, ততটুকু পরিমাণে তার মর্যাদা সমুন্নত হবে, মান উন্নত হবে এবং সম্মান বৃদ্ধি পাবে; ফলে সে আল্লাহর অভিভাবকত্ব ও তা তাঁর তত্ত্বধানে থাকা ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাঁর রহমত ও নি'য়ামত পাওয়ার উপযুক্ত হবে।

আর এটাই মুসলিম ব্যক্তির দীর্ঘ জীবনের একমাত্র চাওয়া এবং চূড়ান্ত প্রত্যাশা।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার অভিভাবকত্ব নসীব করুন, আপনি আমাদেরকে আপনার তত্ত্বধান থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং আমাদেরকে আপনার নিকটতম বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত করুন;

হে আল্লাহ! হে জগতসমূহের প্রতিপালক! আমাদের আবেদন কবুল করুন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪০৫

মুসলমানদের ১৫ টি প্রশংসনীয় চারিত্রিক গুনাবলী

কাল পতাকা

Senior Member

০৮-১৭-২০১৫

ইসলামী শরীয়ত হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি যা সকল দিক থেকে সার্বিকভাবে মুসলমানের ব্যক্তিগত জীবনকে গঠন করার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে এসব দিকের মধ্যে গুনাবলি শিষ্টাচার ও চরিত্রের দিকটি অন্যতম। ইসলাম এদিকে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। তাইতো আকীদা ও আখলাকের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছে, যেমন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,"মুমিনদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানদার হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।" [আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযি]

সুতরাং উত্তম চরিত্র হচ্ছে ঈমানের প্রমাণবাহী ও প্রতিফলন। চরিত্র ব্যতীত ঈমান প্রতিফলিত হয় না বরং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁকে প্রেরণের অন্যতম মহান উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্রের উত্তম দিকসমূহ পরিপূর্ণ করে দেয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমি তো কেবল চরিত্রের উত্তম দিকসমূহ পরিপূর্ণ করে দিতে প্রেরিত হয়েছি।" ইমাম আহমাদ ও ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদে বর্ণনা করেছেন।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা উত্তম ও সুন্দরতম চরিত্রের মাধ্যমে তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, "নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।" [সূরা আল, কালাম : ৪]

কোথায় এ চরিত্র বর্তমান বস্তুবাদী মতবাদ ও মানবতাবাদী মানুষের মনগড়া চিন্তা চেতনায় ?

যেখানে চরিত্রের দিককে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছে, তা শুধু সুবিদাবাদী নীতিমালা ও বস্তুবাদী স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদিও তা অন্যদের উপর জুলুম বা

নির্যাতনের মাধ্যমে হয়। অন্য সব জাতির সম্পদ লুণ্ঠন ও মানুষের সম্মান হানীর মাধ্যমে অর্জিত হয়।

একজন মুসলমানের উপর তার আচার-আচরণে আল্লাহর সাথে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে, অন্য মানুষের সাথে, এমনকি নিজের সাথে কি ধরনের আচরণ করা উচিত ইসলাম তার এক অভিনব চকমপ্রদ চিত্র অংকন করে দিয়েছে। যখনই একজন মুসলমান বাস্তবে ও তার লেনদেনে ইসলামী চরিত্রের অনুসরণ করে তখনই সে অভিষ্ট পরিপূর্ণতার অতি নিকটে পৌঁছে যায়, যা তাকে আরো বেশি আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও উচ্চ মর্যাদার সোপানে উন্নীত হতে সহযোগিতা করে। পক্ষান্তরে, যখনই একজন মুসলমান ইসলামের চরিত্র ও শিষ্টাচার হতে দূরে সরে যায় সে বাস্তবে ইসলামের প্রকৃত প্রাণ চাঞ্চল্য, নিয়ম-নীতির ভিত্তি হতে দূরে সরে যায়। সে যান্ত্রিক মানুষের মত হয়ে যায়, যার কোন অনুভূতি এবং আত্মা নেই।

ইসলামে ইবাদতসমূহ চরিত্রের সাথে কঠোরভাবে সংযুক্ত। যে কোন ইবাদত একটি উত্তম চরিত্রের প্রতিফলন ঘটায় না তার কোন মূল্য নেই। আল্লাহর সামনে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় নামায একজন মানুষকে অশ্লীল অপছন্দ কাজসমূহ হতে রক্ষা করে, আত্মশুদ্ধি ও আত্মার উন্নতি সাধনে এর প্রভাব রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল, অপছন্দনীয় কাজ হতে নিষেধ করে।" [সূরা আল-আনকাবুত :৪৫]

অনুরূপভাবে রোযা তাক্বওয়ার দিকে নিয়ে যায়। আর তাক্বওয়া হচ্ছে মহান চরিত্রের অন্যতম, যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন,

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমনি ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা তাক্বওয়া লাভ করতে পার।" [সূরা আল বাকারা : ১৮৩]

• রোযাঃ অনুরূপভাবে শিষ্টাচার, ধীরস্থিরতা, প্রশান্তি, ক্ষমা, মুর্খদের থেকে বিমুখতা ইত্যাদির প্রতিফলন ঘটায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "তোমাদের কারো রোযার দিন যদি হয়, তাহলে সে যেন অশ্লীল কথাবার্তা না বলে, হৈ চৈ না করে অস্থিরতা না দেখায়। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে লড়াই করে সে যেন বলে দেয় আমি রোযাদার। বুখারী ও মুসলিম

• যাকাতঃ অনুরূপভাবে অন্তরকে পবিত্র করে, আত্মাকে পরিমার্জিত করে এবং তাকে কৃপণতা, লোভ ও অহংকারের ব্যধি হতে মুক্ত করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,"তাদের সম্পদ হতে আপনি সাদকাহ গ্রহণ করুন যার মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিমার্জিত করবেন।" [সূরা তাওবাহ ১০৩ আয়াত]

• হজ্জঃ আর হজ্জ হচ্ছে একটি বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণশালা আত্মশুদ্ধি এবং হিংসা বিদ্বেষ ও পঙ্কিলতা থেকে আত্মাকে পরিশুদ্ধি ও পরিমার্জনের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, "যে এ মাস গুলোতে নিজের উপর হজ্জ ফরয করে নিল সে যেন অশ্লীলতা, পাপাচার ও ঝগড়া বিবাদ হজ্জের মধ্যে না করে।" [সূরা আল বাকারাহ : ১৯৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

"যে ব্যক্তি অশ্লীল কথা-বার্তা ও পাপ কর্ম না করে হজ্জ পালন করল, সে তার পাপ রাশি হতে তার মা যেদিন জন্ম দিয়েছে সে দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে ফিরে এল।" [বুখারী ও মুসলিম]

ইসলামী চরিত্রের মৌলিক বিষয়সমূহ

১ সত্যবাদিতা:

আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের যে সকল ইসলামী চরিত্রের নির্দেশ দিয়েছেন, তার অন্যতম হচ্ছে সত্যবাদিতার চরিত্র। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"হে ঈমানদারগণ আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা সত্যবাদীদের সাথী হও।" সূরা আত-তাওবাহ : ১১৯

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

"তোমরা সততা অবলম্বন গ্রহণ কর, কেননা সত্যবাদিতা পুণ্যের পথ দেখায় আর পূণ্য জান্নাতের পথ দেখায়, একজন লোক সর্বদা সত্য বলতে থাকে এবং সত্যবাদিতার প্রতি অনুরাগী হয়, ফলে আল্লাহর নিকট সে সত্যবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।" মুসলিম

২ আমানতদারিতা :

মুসলমানদের সে সব ইসলামী চরিত্র অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার একটি হচ্ছে আমানতসমূহ তার অধিকারীদের নিকট আদায় করে দেয়া। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের নিকট আদায় করে দিতে।" সূরা আন নিসা : ৫৮

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট আল আমীন উপাধি লাভ করেছিলেন, তারা তাঁর নিকট তাদের সম্পদ আমানত রাখত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার অনুসারীদের মুশরিকরা কঠোর ভাবে নির্যাতন শুরু করার পর যখন আল্লাহ তাকে মক্কা হতে মদীনা হিজরত করার অনুমতি দিলেন তিনি আমানতের মালসমূহ তার অধিকারীদের নিকট ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা না করে হিজরত করেননি। অথচ যারা আমানত রেখেছিল তারা সকলেই ছিল কাফের। কিন্তু ইসলাম তো আমানত তার অধিকারীদের নিকট ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছে যদিও তার অধিকারীরা কাফের হয়।

মুসলমানদের ১৫ টি প্রশংসনীয় চারিত্রিক গুনাবলীঃ

পরের আংশ

৩ অঙ্গীকার পূর্ণ করা:

ইসলামী মহান চরিত্রের অন্যতম হচ্ছে অঙ্গীকার পূর্ণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন "আর অঙ্গীকার পূর্ণ কর, কেননা অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।" সূরা ইসরা : ৩৪

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিশ্রতি ভঙ্গকরা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য করেছেন।

৪ বিনয় :

ইসলামী চরিত্রের আরেকটি হচ্ছে একজন মুসলমান তার অপর মুসলিম ভাইদের সাথে বিনয়ী আচরণ করবে। সে ধনী হোক বা গরীব। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "তুমি তোমার পার্শ্বদেশ মুমিনদের জন্য অবনত করে দাও।" সূরা আল হিজর : ৮৮

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

“আল্লাহ তাআলা আমার নিকট ওহী করেছেন যে, ‘তোমরা বিনয়ী হও যাতে একজন অপরজনের উপর অহংকার না করে। একজন অপর জনের উপর সীমালংঘন না করে।” -মুসলিম।

৫ মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার:

মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার উত্তম চরিত্রের অন্যতম। আর এটা তাদের অধিকার মহান হওয়ার কারণে, যে অধিকার স্থান হল আল্লাহর হকের পরে।আল্লাহ তাআলা বলেনঃ
‘আর আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর।” [সূরা আন-নিসা : ৩৫ আয়াত]

আল্লাহ তাআলা তাদের আনুগত্য, তাদের প্রতি দয়া ও বিনয় এবং তাদের জন্য দু’আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

“তাদের উভয়ের জন্য দয়ার সাথে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে আমাকে তারা লালন-পালন করেছেন।” [সূরা আল ইসরা : ২৪]

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার সবচেয়ে বেশী অধিকারী ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন, ‘তোমার মা।’ অত:পর জিজ্ঞেস করল

তারপর কে? তিনি উত্তর দিলেন, ‘তোমার মা।’ অতঃপর জিজ্ঞেস করল তার পর কে? তিনি উত্তর দিলেন, ‘তোমার মা।’ অতঃপর জিজ্ঞেস করল তার পর কে? উত্তর দিলেন, ‘তোমার পিতা।’ [বুখারী ও মুসলিম]

মাতা-পিতার প্রতি এ সদ্ব্যবহার ও দয়া অনুগ্রহ অতিরিক্ত বা পূর্ণতা দানকারী বিষয় নয় বরং তা হচ্ছে সকল মানুষের ঐক্যমতের ভিত্তিতে ফরযে আইন।

৬ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা :

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ইসলামী চরিত্রের অন্যতম। আর তারা হচ্ছে নিকটাত্মীয়গণ যেমন, চাচা, মামা, ফুফা, খালা, ভাই, বোন প্রমূখ।

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব, আর তা ছিন্ন করা জান্নাত হতে বঞ্চিত ও অভিশাপের কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

" যদি তোমরা ক্ষমতা পাও, তাহলে কি তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে? তারা তো ঐ সব লোক যাদের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেছেন। এতে তিনি তাদেরকে বধির করে দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টি অন্ধ করে দিয়েছেন।" [সূরা মুহাম্মাদ : ২২-২৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

"আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না।" [বুখারী ও মুসলিম]

৭ প্রতিবেশীর প্রতি সুন্দরতম ব্যবহার:

প্রতিবেশীর প্রতি সুন্দরতম ব্যবহার হচ্ছে ইসলামী চরিত্রের অন্যতম। প্রতিবেশী হচ্ছে সে সব লোক যারা আপনার বাড়ীর আশে পাশে বসবাস করে। যে আপনার সবচেয়ে নিকটবর্তী সে সুন্দর ব্যবহার ও অনুগ্রহের সবচেয়ে বেশী হকদার। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"আর মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর, নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকীন নিকটতম প্রতিবেশী ও দূরবর্তী প্রতিবেশীর প্রতিও।" [সূরা আন-নিসা : ৩৬]

এতে আল্লাহ নিকটতম ও দূরবর্তী প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার করতে ওসিয়ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেনঃ 'জিবরীল আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে ওসিয়ত করতেছিল এমনকি আমি ধারণা করেনিলাম যে, প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকার বানিয়ে দেয়া হবে।' [বুখারী ও মুসলিম] অর্থাৎ আমি মনে করেছিলাম যে ওয়ারিশদের সাথে প্রতিবেশীর জন্য মিরাসের একটি অংশ নির্ধারিত করে দেবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু যর রা. কে লক্ষ্য করে বলেন,

‘হে আবু যর! যখন তুমি তরকারী পাক কর তখন পানি বেশি করে দাও, আর তোমার প্রতিবেশীদের অঙ্গীকার পূরণ কর।” [মুসলিম]

প্রতিবেশীর পার্শ্বাবস্থানের হক রয়েছে যদিও সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী বা কাফের হয়।

৮ মেহমানের আতিথেয়তা:

ইসলামী চরিত্রের আরেকটি হচ্ছে মেহমানের আতিথেয়তা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী,

“যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।” [বুখারী ও মুসলিম]

৯ সাধারণভাবে দান ও বদান্যতা:

ইসলামী চরিত্রের অন্যতম দিক হচ্ছে দান ও বদান্যতা। আল্লাহ তাআলা ইনসাফ, বদান্যতা ও দান কারীদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে অতঃপর যা খরচ করেছে তা থেকে কারো প্রতি অনুগ্রহ ও কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্য করে না, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাও করবে না।” [সূরা আল বাকারাহ : ২৬২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

‘যার নিকট অতিরিক্ত বাহন থাকে সে যেন যার বাহন নেই তাকে তা ব্যবহার করতে দেয়। যার নিকট অতিরিক্ত পাথেয় বা রসদ রয়েছে সে যেন যার রসদ নেই তাকে তা দিয়ে সাহায্য করে।” [মুসলিম]

১০ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা:

ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা হচ্ছে ইসলামী চরিত্রের অন্যতম বিষয়। অনুরূপভাবে মানুষদের ক্ষমা করা, দুর্ব্যবহারকারীকে ছেড়ে দেয়া ওজর পেশকারীর ওজর গ্রহণ করা বা মেনে নেয়াও অন্যতম। আল্লাহ তাআলা বলেন :

“আর যে ধৈর্য্য ধারণ করল এবং ক্ষমা করল, নিশ্চয়ই এটা কাজের দৃঢ়তার অন্তর্ভূক্ত।” [সূরা আশ শুরা : ৪৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

‘তারা যেন ক্ষমা করে দেয় এবং উদারতা দেখায়, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেয়া কি তোমরা পছন্দ কর না?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “দান খয়রাতে সম্পদ কমে যায় না। আল্লাহ পাক ক্ষমার দ্বারা বান্দার মার্যাদাই বৃদ্ধি করে দেন। যে আল্লাহর জন্য বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহ তার সম্মানই বৃদ্ধি করে দেন।” [মুসলিম] তিনি আরো বলেন, “দয়া কর, তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে। ক্ষমা করে দাও তোমাদেরও ক্ষমা করে দেয়া হবে।” [আহমাদ]

মুসলমানদের ১৫ টি প্রশংসনীয় চারিত্রিক গুনাবলীঃ

৩য় পর্ব

১। ১ মানুষের মাঝে সমঝোতা ও সংশোধন:

ইসলামী চরিত্রের আরেকটি হচ্ছে মানুষের মাঝে সমঝোতা ও সংশোধন করে দেয়া, এটা একটি মহান চরিত্র যা ভালবাসা সৌহার্দ প্রসার ও মানুষের পারস্পারিক সহযোগিতার প্রাণের দিকে নিয়ে যায়।আল্লাহ তাআলা বলেন:

“তাদের অধিকাংশ শলাপরামর্শের মধ্যে কল্যাণ নেই। কেবল মাত্র সে ব্যক্তি ব্যতীত যে সাদকাহ, সৎকর্ম ও মানুষের মাঝে সংশোধনের ব্যাপারে নির্দেশ দেয়। যে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এসব করে অচিরেই আমরা তাকে মহা প্রতিদান প্রদান করব।” [সূরা আন নিসা : ১১৪]

১।২ লজ্জা:

ইসলামী চরিত্রের অন্যতম আরেকটি চরিত্র হচ্ছে লজ্জা। এটা এমন একটি চরিত্র যা পরিপূর্ণতা ও মর্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের দিকে আহবান করে। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা হতে বারণ করে। লজ্জা আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে। ফলে মুসলমান লজ্জা করে যে, আল্লাহ তাকে পাপাচারে লিপ্ত দেখবে। অনুরূপভাবে মানুষের থেকে এবং নিজের থেকেও সে লজ্জা করে। লজ্জা অন্তরে ঈমান থাকার প্রমাণ বহন করে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

‘লজ্জা ঈমানের বিশেষ অংশ।’ [বুখারী ও মুসলিম]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "লজ্জা কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না।" [বুখারী ও মুসলিম]

১।৩ দয়া ও করুণা:

ইসলামী চরিত্রের আরেকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে দয়া বা করুণা। এ চরিত্রটি অনেক মানুষের অন্তর হতে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। ফলে তাদের অন্তর পাথরের মত অথবা এর চেয়েও শক্ত হয়ে গেছে। আর প্রকৃত মু'মিন হচ্ছে দয়াময়, পরোপকারী, গভীর অনুভূতি সম্পন্ন উজ্জল অনুগ্রহের অধিকারী। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "অত:পর সে তাদের অন্তর্ভূক্ত হয় যারা ঈমান এনেছে পরস্পর পরস্পরকে ধৈর্য্য ও করুণার উপদেশ দিয়েছে। তারা হচ্ছে দক্ষিণ পন্থার অনুসারী।" [সূরা আল-বালাদ : ১৭- ১৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

"মুমিনদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য, করুণা, অনুকম্পার উপমা হচ্ছে একটি শরীরের মত। যখন তার একটি অঙ্গ অসুস্থ হয় গোটা শরীর নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।" [মুসলিম]

১।৪ ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা:

ন্যায় পরায়ণতা ইসলামী চরিত্রের আরেকটি অংশ। এ চরিত্র আত্মার প্রশান্তি সৃষ্টি করে। সমাজে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন প্রকার অপরাধ বিমোচনের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ইহসান ও নিকটাত্মীয়দের দান করতে নির্দেশ দেন।" [সূরা আল নাহাল : ৯০]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

"ইনসাফ কর, এটা তাক্বওয়ার অতীব নিকটবর্তী।" [সূরা আল মায়িদা : ৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

"ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা আল্লাহর নিকট নূরের মিম্বরের উপর বসবে। তারা হল সে সব লোক, যারা বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে, পরিবার-পরিজনের ক্ষেত্রে এবং যে দায়িত্বই পেয়েছে তাতে ইনসাফ করে।"

১।৫ চারিত্রিক পবিত্রতা:

ইসলামী চরিত্রের অন্যতম বিষয় হচ্ছে চারিত্রিক পবিত্রতা। এ চরিত্র মানুষের সম্মান সংরক্ষণ এবং বংশে সংমিশ্রন না হওয়ার দিকে পৌঁছে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

“যাদের বিবাহের সামর্থ নেই, তারা যেন চারিত্রিক পবিত্রতা গ্রহণ করে। যতক্ষণ না আল্লাহ তার অনুগ্রহে তাকে সম্পদশালী করেন।” [সুরা আন নূর-৩৩]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

“তোমরা আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের জিম্মাদার হও। তাহলে আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হব। যখন তোমাদের কেউ কথা বলে সে যেন মিথ্যা না বলে। যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন যেন খেয়ানত না করে। যখন প্রতিশ্র“তি দেয় তা যেন ভঙ্গ না করে। তোমরা তোমাদের দৃষ্টি অবনত কর। তোমাদের হস্তদ্বয় সংযত কর। তোমাদের লজ্জাস্থান হেজাফত কর।” [হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন]

ইসলামের এ সব চরিত্রে এমন কিছু নেই যা ঘৃণা করা যায়। বরং এসব এমন সম্মান যোগ্য মহৎ চারিত্রাবলী যা প্রত্যেক নিষ্কলুষ স্বভাবের অধিকারীর সমর্থন লাভ করে। মুসলমানগণ যদি এ মহৎ চরিত্র ধারণ করত তাহলে সর্বস্থান থেকে তাদের নিকট মানুষ আগমন করত এবং দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে তারা প্রবেশ করত যেভাবে প্রথম যুগের মুসলমানদের লেন-দেন ও চরিত্রের কারণে সে সময়ের মানুষ ইসলামে প্রবেশ করেছিল।

সমাপ্ত

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪৬৪

সুযোগের সদ্ব্যবহার না করার ভয়াবহতা (১)

Raghib Ansar

Senior Member

০৮-১৮-২০১৫

সুযোগের সদ্ব্যবহার না করার ভয়াবহতা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কোন ইলাহ নেই। সালাম এবং রহমত বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর।

অত:পর,

নি:সন্দেহে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার নিয়ামাত গুণে শেষ করতে পারবো না, যার অগণিত নিয়ামাত আমাদের ঘিরে রয়েছে। এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামাত হচ্ছে, যাকে আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা ঈমান দিয়েছেন এবং তাকে সে অনুযায়ী চলার তৌফিক্ব দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাতকে জিহাদ ফি সাবী লিল্লাহ দিয়ে সম্মানীত করেছেন, যদি আমরা উপলব্ধি করি। আর এটা এজন্য যে, আল্লাহ মু'মিনদের হাতে কাফিরদের শাস্তি দিতে পছন্দ করেছেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সাহাবীদের সর্বাক্তক জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার শারী'আহ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে, তারা এত বড় কোরবানী করেছেন বলেই আমরা আজ উঁচু গলায় ইসলামের ডাক দিতে পারছি আল্লাহর অনুমতিক্রমে। একমাত্র জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহ ইসলামের দুশমনদের গোড়া কর্তণ করেছেন।

যাইহোক, আল্লাহর অশেষ রহমতে দুনিয়ার অনেক জায়গায় আবার জিহাদ বুলন্দ হচ্ছে। এবং নিঃসন্দেহে সম-সাময়িক আলিমদের ঐক্যমতে আজ সারা দুনিয়ায় যেখানে জিহাদের ফ্রন্ট (ময়দান) উম্মোচিত হয়েছে বা হয়নি, সে সব জায়গায় জিহাদ প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফারদুল আ'ইন হিসাবে পরিগনিত হচ্ছে। সে হিসেবে, আল্লাহ কুর'আনে যাদেরকে জিহাদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন তারা

ব্যতীত সকল মুসলিমের উপর জান এবং মাল দিয়ে তাগুত ও মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফারদুল আ'ইন। যেমন আল্লাহ কুর'আনে বলেনঃ "আর ছলনাকারী বেদুঈন লোকেরা এলো, যাতে তাদের অব্যাহতি লাভ হতে পারে এবং নিবৃত্ত থাকতে পারে তাদেরই যারা আল্লাহ ও রসূলের সাথে মিথ্যা বলে ছিল। এবার তাদের উপর শীঘ্রই আসবে বেদনাদায়ক আযাব যারা কাফির। দূর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ্য লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই, যখন তারা মনের দিক থেকে পবিত্র হবে আল্লাহ ও রসূলের সাথে। নেককারদের উপর অভিযোগের পথ নেই। আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী দয়ালু।''[সূরা আৎ-তাওবা(৯):৯০-৯১]

যে পরিস্থিতিতে মুরতাদ শাসকগণ আজ সারা দুনিয়ায় আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শারী'আহ পরিবর্তন করে নিজের হাতে বানানো আইন দ্বারা মুসলিম উম্মাহকে শাসন করছে এবং তাদেরকে এই কুফর আইনের উপর চলতে বাধ্য করছে, এমতাবস্থায় কোন মু'মিনের জন্য ঘরে বসে থাকা শোভনীয় নয়, যদি আমরা আসলেই আল্লাহ এবং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভালবাসি। কারণ এমতাবস্থায় কোন শারী'আহ সঙ্গত ওযর ছাড়া জিহাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে ঘরে বসে থাকা নিফাক্বের পরিচয় হিসাবে ক্বুর'আনে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন:

''আর যখন নাযিল হয় কোন সূরা যে, তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর, তাঁর রসূলের সাথে একাত্ব হয়ে; তখন বিদায় কামনা করে তাদের সামর্থ্যবান লোকেরা এবং বলে আমাদের অব্যাহতি দিন, যাতে আমরা (নিষ্ক্রিয়ভাবে) বসে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পারি। তারা পিছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে এবং মোহর এঁটে দেয়া (সমস্ত রকম ভাল এবং সঠিক হিদায়াত থেকে) হয়েছে তাদের অন্তর সমূহের উপর। বস্ত্তত তারা বোঝে না।''[সূরা আৎ-তাওবা(৯): ৮৬-৮৭]

আমাদের মুজাহিদ শাইখ্ আনোয়ার আওলাক্বী (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন) তার মাশ'আরী আল আশওয়াক নামক সিরিজ লেকচারে এই আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন:

''(যার সারমর্ম হচ্ছে) এই সমস্ত মুনাফিক্ব যারা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সলাত আদায় করেছে, তারঁ সাথে উঠা বসা করেছে, তাঁর

মুখ থেকে সরাসরি ক্বুরআন এবং হাদীছ শুনেছে, জ্ঞানী সাহাবীদের সাথে সময় অতিবাহিত করেছে যার ফলে তারা আমাদের থেকে শারী'আর ব্যাপারে বেশী জ্ঞানী ছিল কিন্তু তারপর যখন তারা তাবুক অভিযানে রসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে না গিয়ে ঘরে বসে থাকবেন বেশী আনন্দিত ছিল, যার কারণে আল্লাহ তাদের ক্বালবে্ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এত জ্ঞানী হওয়া সত্বেও আল্লাহ বলেছেন তারা দ্বীন বোঝে না।''

তাই প্রত্যেক মু'মিনের উচিত জিহাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহর সামনে নিজের ঈমানের সত্যবাদিতা প্রমাণ করা। এবং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন ঈমানের দাবিতে কারা সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদী। কোন কোন সময় আল্লাহ মু'মিনদের জীবনে তাকে আ'মলে সালিহ করার সুযোগ দেন; যে এই সুযোগের মর্যাদা বুঝে তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পাথেয় বানায় সেই প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান। এবং এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার কারণে আল্লাহ তাকে একের পর এক আমলে সালিহ করার তৌফিক্ব দান করেন। নি:সন্দেহে ভাল আ'মল আল্লাহর তৌফিক্বক্রমে সম্পাদিত হয়। অন্যদিকে এই আ'মলে সালিহ করার সুযোগকে যারা মর্যাদা দেয় না এবং একে কাজে লাগায় না, হয়ত তারা পরবর্তীতে আফসোস করবে, এমনও হতে পারে এই সুযোগ তার জীবনে আর দ্বিতীয় বার আসবে না। তাই প্রত্যেক মু'মিনের উচিত যখন জিহাদের ডাক আসে, আর তখন সে সব দিক দিয়ে স্বশরীরে জিহাদ করতে সক্ষম অথবা মাল দিয়ে অথবা জিহাদের অন্যান্য কাজে সহযোগীতা করতে সক্ষম: প্রথম অবস্থাতেই তার ডাকে সাড়া দেওয়া। অন্যথায় আল্লাহ তাকে পরবর্তীতে আর জিহাদ করার তৌফিক্ব নাও দিতে পারেন।

যেমন আল্লাহ তা'আলা ক্বুর'আনে কারীমে বলেন:

''বস্তত: আল্লাহ যদি তোমাকে তাদের মধ্য থেকে কোন শ্রেণীবিশেষের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং অত:পর তারা তোমার কাছে অভিযানে বেরোবার অনুমতি কামনা করে, তবে তুমি বলো যে, তোমরা কখনো আমার সাথে বেরোবে না এবং আমার পক্ষ হয়ে কোন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না, তোমরা তো প্রথমবারে বসে থাকা পছন্দ করেছ, কাজেই পিছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথেই বসে থাক।''[সূরা আৎ-তাওবা(৯):৮৩]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাছীর (রহীমাহুল্লাহ) তার তাফসীরে বলেন: (অধ্যায়) মুনাফিক্বদের জিহাদে যাওয়া থেকে বাঁধা দেয়া হয়েছে: আল্লাহ তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নির্দেশ দেন: (বস্ত্তত: আল্লাহ যদি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এই অভিযান (তাবুক) থেকে (কোন শ্রেণীবিশেষের দিকে) ক্বাতাদার মত অনুযায়ী এখানে (মদীনার) বার জন (মুনাফিক্ব) কে ইঙ্গিত করা হয়েছে,(এবং অত:পর তারা তোমার কাছে অভিযানে বেরোবার অনুমতি কামনা করে) আপনার [রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] সাথে অন্য যুদ্ধে যাওয়ার জন্য, (তবে তুমি বলো যে, তোমরা কখনো আমার সাথে বেরোবে না এবং আমার পক্ষ হয়ে কোন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না) এটা (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাদের জন্য ধমক এবং শাস্তিস্বরুপ। আল্লাহ এই (শাস্তির) সিদ্বান্তের পিছনে বলেন: (তোমরা তো প্রথমবারে বসে থাকা পছন্দ করেছ)

এরকম অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

''আর আমরাও তাদের অন্ত:করণ ও তাদের দৃষ্টি পাল্টে দেব যেমন তারা প্রথমবার এতে ঈমান আনে নি; আর তাদের ছেড়ে দেবো তাদের অবাধ্যতার মধ্যে উদ্ভ্রান্ত ভাবে ঘুরে বেড়াতে।'' [সূরা আন'আম(৬):১১০]

একটি মন্দ কর্মের শাস্তি স্বরুপ কাউকে অন্য একটি মন্দ কর্মের দিকে ধাবিত করা হয়। একই ভাবে একটি আমলে সালিহের পুরস্কার স্বরুপ তাকে অন্য একটি আ'মলে সালিহের প্রতি ধাবিত করা হয় ..... আল্লাহ পরবর্তিতে বলেনঃ

(কাজেই পিছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথেই বসে থাক) ইবনে আববাস (রদিআল্লাহু আনহু) এর মত অনুযায়ী এখানে ঐসব লোকদের ইঙ্গিত করা হয়েছে যারা (তাবুক) অভিযানে না গিয়ে ঘরে বসে ছিল। Tafsir Ibn Kathir (abridged), Darussalam Vol :৪

আমাদের প্রিয় মুজাহিদ শাইখ আনোয়ার আওলাক্বী তার রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনী: মদীনা পার্ট-২ লেকচার সিরিজে কা'ব ইবনে মালিক (রদিআল্লাহু আনহু) এর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে তাবুক অভিযানে অংশ গ্রহন না করার পিছনে বুখারী শরীফে যে বিখ্যাত হাদীছ স্বয়ং ক'াব ইবনে মালিক (রদিআল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন তার উপর বিশেষ মনোযোগ আকর্ষন করেছেন এবং বলেছেনঃ

''ইমাম ইবনুল ক্বইয়্যিম (রহীমাহুল্লাহ) এই হাদীছ থেকে আমাদের জন্য কিছু শিক্ষনীয় বিষয় বর্ণনা করেছেন, এর মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছেঃ আল্লাহ যখন কারো জন্য কোন আমলে সালিহ করার সুযোগ খুলে দেন তখন তার উচিত দেরী না করে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। প্রিয় ভাই বোনেরা কোন কোন সময় আল্লাহ আপনাদের জীবনে আমলে সালিহ করার সুযোগ খুলে দেন। এই সুযোগ আসে আবার চলে যায়। কিছু সময় এই সুযোগ ভাল কিছু নিয়ে চলে যায়। যদি আপনারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করেন, তাহলে হতে পারে আপনারা সারা জীবনের জন্য এটা হারাবেন।

কা'ব ইবনে মালিক (রদিআল্লাহু আনহু) এর জন্য তাবুক অভিযানে অংশ গ্রহণের সুযোগ খোলা হয়েছিল কিন্তু তিনি তা হারিয়েছেন। এর মধ্যে শিক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে যেটা তিনি (কা'ব) স্বয়ং বলেছেনঃ ''হায় আফসোস! আমি মনে করেছি আমি (তাবুক অভিযানের) সব প্রস্ত্ততি সম্পন্ন করতে পারব''। তাই জিহাদে অংশ গ্রহণ থেকে পিছনে থাকবেন না, এই ভেবে যে আমি তো যেতেই পারব। তাই আল্লাহ আপনার জন্য যে সুযোগ খুলে দিয়েছেন তার সদ্ধব্যবহার করুন এবং কোন কোন সময় এই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করার পরিণতি অনেক ভয়াবহ হতে পারে, যেমন আল্লাহ বলেন:

''ওহে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ ও রসূলের প্রতি সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদের আহবান করেন তাতে যা তোমাদের জীবন দান করে। আর জানো যে আল্লাহ মানুষের ও তার অন্ত:করণের মাঝখানে বিরাজ করছেন; আর নি:সন্দেহ তিনি – তাঁরই কাছে তোমাদের একত্রিত করা হবে।''[সূরা আনফাল(৬): ২৪]

আল্লাহ আপনাকে পরবর্তীতে (জিহাদে) অংশগ্রহণ করার তৌফিক্ব না দিয়ে আপনার এবং আপনার ক্বলব্বের মাঝে বাঁধা হয়ে দাড়াতে পারেন। তাই যে সুযোগ আপনার জন্য খুলে দেয়া হয়েছে তার সদ্ব্যবহার করুন এবং (জিহাদ থেকে) পিছনে থাকবেন না।

আল্লাহ সূরা আনআ'মে বলেন:

''আর আমরাও তাদের অন্ত:করণ ও তাদের দৃষ্টি পাল্টে দেব যেমন তারা প্রথমবার এতে ঈমান আনে নি; আর তাদের ছেড়ে দেবো তাদের অবাধ্যতার মধ্যে উদ্ভ্রান্ত ভাবে ঘুরে বেড়াতে।''[সূরা আন'আম(৬):১১০]

তারা প্রথমবারে (ঈমান আনতে) প্রত্যাখ্যান করেছে, তাই আল্লাহ তাদের ক্বলব্ এবং চোখ উল্টিয়ে দিয়েছেন, তাই আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা অন্য আয়াতে বলেন:

''আল্লাহ এরূপ নন যে, কোন জাতিকে হিদায়াত করার পর পথভ্রষ্ট করে দেন, যে পর্যন্ত না তাদেরকে সেসব বিষয় পরিস্কারভাবে বলে দেন, যা হতে তারা বেঁচে থাকবে; নি:সন্দেহে আল্লাহ সব- কিছুতে সর্বজ্ঞাতা।''[সূরা আৎ-তাওবা(৯):১১৫]

আল্লাহ তাদের কাছে স্পষ্ট করেছেন তাদের কি পরিত্যাগ করা উচিত। আল্লাহ তাদের সৎ আমল করার সুযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাই আল্লাহ (হিদায়াতের পর) তাদের পথভ্রষ্ট করেছেন।

সুযোগের সদ্ব্যবহার না করার ভয়াবহতা (২)

(ইবনুল ক্বইয়্যিম থেকে বর্ণিত) পরবর্তী শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে: তাবুক অভিযান থেকে শুধুমাত্র তারাই রয়ে গিয়েছিল যারা মুনাফিক্ব, জিহাদ করতে অসমর্থ (অসুস্থ, পঙ্গু ইত্যাদি) এবং যাদেরকে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় থাকার জন্য নিয়োগ করেছেন। তাই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ না করা নিফাক্বের পরিচয় হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে।''

(শাইখ আনোয়ার আওলাক্বীর বক্তব্য শেষ)

আল্লাহর কাছে শুকরিয়া এজন্য যে, কা'ব ইবনে মালিক (রদিআল্লাহু আনহু) এর তাবুকে অংশগ্রহণ না করার ঘটনা, এজন্য তাকে কত বড় খেসারত দিতে হয়েছে এবং এ ঘটনার উপর কুর'আনের আয়াতও [সূরা আৎ-তাওবা(৯):১১৬-১১৭] আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা কি জানি, কা'ব ইবনে মালিক (রদিআল্লাহু আনহু) কত বড় সাহাবী ছিলেন? তিনি হচ্ছেন একজন বড় আলিম সাহাবী, যিনি বদর ছাড়া সব যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন, এমনকি বাইয়াতে আ'কাবায়ও। যে বাইয়াতকে

সাহাবীরা বদর যুদ্ধ থেকেও বেশী ফযীলতপূর্ণ মনে করতেন। তাও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার পিছনে তার সঙ্গত কারণ ছিল। তাই ক'াব ইবনে মালিকের যদি শুধু একটি অভিযানে অংশগ্রহণ না করার জন্য এত বড় খেসারত দিতে হয়েছে, যার বর্ণনা কা'ব (রদিআল্লাহু আনহু) স্বয়ং দিয়েছেন এবং ক্বুর'আনেও বর্ণিত হয়েছে; তাহলে আমাদের অবস্থা কি, যারা এখনও জিহাদ থেকে পিছনে রয়েছি, এমন কি জিহাদে কোন অংশগ্রহণও নেই; কোন শারী'য়াহ সঙ্গত ওযর ছাড়া। কিসের উপর ভিত্তি করে আমরা নিশ্চিন্ত বসে আছি?

আর একটি বিষয় হচ্ছে, তখন তো কা'ব ইবনে মালিকের তওবা কবুল করে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যার কারণে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, আল্লাহ কা'ব (রদিআল্লাহু আনহু) এর তওবা কবুল করেছেন। এমন কি সত্য কথা বলতে কি; এ ঘটনার পর কা'ব (রদিআল্লাহু আনহু) এর মর্যাদা সাহাবীদের মাঝে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের কারও অবস্থার উপর এখন তো আর অহী অবতীর্ণ হবে না, তাই কেউ যদি আল্লাহর রাস্তা থেকে অনেক দূরে সরেও যায়, তাহলে কিভাবে বুঝবো? তাই ক্বা'বের এই ঘটনার পর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীগণ যে শিক্ষা নিয়েছেন এবং সতর্ক হয়েছেন, তার থেকেও বেশী সতর্ক আমাদের হওয়া উচিত, যেন আমরা এত বড় বিপর্যয় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পরি। আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন। কারণ কা'বের এই ঘটনার উপর ভিত্তি করে পূর্ববর্তী এবং বর্তমান যুগের আলিমদের অনেক কিতাব এবং আলোচনা রয়েছে। প্রবন্ধ ছোট না করার ইচ্ছা থাকলে, আমি সেখান থেকে কিছু এখানে উল্লেখ করার চেষ্টা করতাম। বিশেষ করে শাইখ ওসামা বিন লাদেনের লিখিত কিতান ''দারসে হাদীছে ক্বা'ব (রদিআল্লাহু আনহু) ''।

তাই আমি ভাই-বোনদের বলব, বুখারী শরীফ (Vol.৫, Book ৫৯, Hadith ৭০২, Riyad-us- Saliheen Hadith:২১) থেকে স্বয়ং ক্বা'ব ইবনে মালিকের জবানী থেকে এই হাদীছ পড়তে নয়, বরং পর্যবেক্ষণ করে নিজ নিজ অবস্থার হিসাব নিতে, আল্লাহই একমাত্র তাউফীক্ব দাতা।

তাই আমি বলছি, আমরা যদি, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনী পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাব, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) জিহাদ থেকে কাউকে অব্যাহতি দেন নি, না আলিম সাহাবীদেরকে, না ধনী সাহাবীদেরকে, না গরীব সাহাবীদেরকে, না তখনকার গোত্রপতী সাহাবীদেরকে, না তখনকার রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী সাহাবীদেরকে; আর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনেই রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। তবে যদি জিহাদের বা জামা'আতের আমির কাউকে কোন বিশেষ কাজে নিয়োজিত করেন, তবে তা ভিন্ন কথা। যেমন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলী (রদিআল্লাহু আনহু) কে তাবুক অভিযানের সময় মদীনায় নিয়োগ করেছেন, এটা আলী (রদিআল্লাহু আনহু) এর কোন ব্যক্তিগত অভিমত ছিল না, তিনি তাবুক অভিযানে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে যাওয়ার জন্য আকুল ছিলেন।

তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজেকে আমিরের সামনে পেশ করা, জিহাদের আমির তার অবস্থা বুঝে তাকে তার উপযুক্ত জায়গায় কাজ করার জন্য নিয়োগ করবেন। যেমন খুরাসানের বর্তমান মুজাহিদদের আমির আবু আবদুল্লাহ আতিয়া আল্লাহ আল-লিবিব (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন) একটি লিখিত প্রবন্ধে বলেন:

''সেজন্য এখন আমাদের জন্য জিহাদ ফারদুল আ'ইন বলতে আমরা যা বুঝাতে চাচ্ছি তা হল: প্রত্যেক মুসলিম তার সামর্থ অনুযায়ী এবং যেটা তার জন্য উপযুক্ত ও যেটা তাকে করতে বলা হয়েছে, সেভাবে (জিহাদের) কাজ করবে। এবং অবশেষে শাইখ্ আবদুল্লাহ আয্যাম (রহীমাহুল্লাহ) এর ''Join The Caravan'' কিতাব থেকে নকল করে যেটা আমি বার বার বলেছি যে, যে তার জান এবং প্রস্তুতি কোরবানী করে জিহাদ এবং মুজাহিদীনদের কাফিলায় যোগ দিয়েছে এবং তার কথাকে আমলে পরিণত করেছে এই বলে যে: ''এখানে আমি মুসলিমদের একজন তীর (অর্থাৎ মুসলিম আর্মিদের সাথে জিহাদ করতে প্রস্তুত) হিসাবে হাজির আছি, তাই মুসলিমদের আমির আমাকে যেখানে ইচ্ছা (জিহাদের) কাজে লাগাক।''

তাই আমি উদাহরণ স্বরূপ বলছি; ওমুক এবং ওমুক চেচ্নিয়ায় জান, কারণ সেখানে ওমুকের প্রয়োজন এবং তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব। এবং ওমুক -ওমুক (জিহাদের) ওমুক জায়গায় যান এবং ওমুক আপনার নিজ জায়গায় অবস্থান করে (জিহাদের জন্য) মাল (অর্থ) সংগ্রহ করুন, ব্যবসা করুন, (দ্বীনের জন্য) লিখুন, বলুন,

দাওয়া দিন, মিডিয়ার কাজ করুন অথবা জ্ঞান অর্জন করতে থাকুন এবং ওমুক ও ওমুক ওমুক -ওমুক কাজ করুন। তাই বুঝা গেল যার জন্য জিহাদের আমিরের সাথে যোগাযোগ সম্ভব, যাতে করা তারা (জিহাদের আমিরগণ) জানতে পারেন তার জন্য (দ্বীনের) কোন কাজ উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয়, এগুলো সবই সম্পাদিত হবে ঈমানের সাথে, সত্যবাদীতার সাথে, ইখলাছের সাথে।

যারা এটা করতে সক্ষম নয়; যাদের সংখ্যাই বেশী তাদের সাধারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী আগানো উচিৎ এবং যতটুকু সম্ভব (আল্লাহর রাস্তায়) চেষ্টা-সাধনা করা উচিৎ। এগুলোর জন্য আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ তাক্বওয়া জরুরী। প্রয়োজনে জিহাদের ব্যাপারে অধিক জ্ঞানী, সত্যবাদী এবং সালিহ্ লোকদের সাথে পরামর্শ করুন। আল্লাহ তাদের হিদায়াত এবং সফলতা দান করুন।

ইনশা'আল্লাহ এভাবে তারা তাদের (জিহাদের) দায়িত্বের প্রতি সম্মান দেখাতে পারবে এবং নিজেদের (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত করতে পারবে। আল্লাহর কাছে শুধু তাক্বওয়াই গ্রহণযোগ্য। সেজন্য সত্য কথা বলতে কি; এই সময়ে জিহাদ করার জন্য পিতা-মাতার কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই। সব কিছুর ব্যাপারে আল্লাহই অধিক জ্ঞানী এবং নেই কোন শক্তি, নেই কোন ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া।'' (আবু আবদুল্লাহ আতিয়া আল্লাহ আল-লিবিবর বক্তব্য শেষ)

তাই কেউ যদি জিহাদের জন্য শুধু মাল খরচ করে, এটা তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহনযোগ্য যতক্ষণ সে জান দিয়ে জিহাদ না করতে পারে; কোন শারী'য়াহ সঙ্গত ওযরের কারণে, অনুরুপভাবে যারা জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছে তাদেরও মাল খরচ করতে হবে সামর্থ অনুযায়ী। আর কেউ শারী'য়াহ সঙ্গত ওযরের কারণে যদি জান এবং মাল কোন টাই দিতে না পারে, তাহলে তার উচিত জিহাদ এবং দাওয়ার কাজে সার্বিক সহযোগীতার চেষ্টা করা। (এসব ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে কেউ আনোয়ার আল আওলাকীর মাশ'আরী আল আশওয়াক সিরিজ লেকচার শুনতে পারেন এবং তারই লিখা কিতাব '' ৪৪ Ways to Serve & Parcipate in Jihaad'' পড়তে পারেন) আর প্রকৃত পক্ষে সব কিছুই নির্ভর করে নিয়্যত এবং ইখলাছের উপর। কেউ যদি শারী'য়াহ সঙ্গত ওযরের কারণে জিহাদ না করতে পারেন, তাহলে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট

এবং ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তার জন্য রাস্তা খুলে দিবেন। এর জন্য তাক্বওয়া, সবর, তাওয়াক্কুল এবং ইস্তিক্বামাত একান্ত জরুরী।

কারণ এগুলো এজন্যই বলছি যে, সম্প্রতি জিহাদের হুকুমের ব্যাপারে অনেকের মধ্যে কিছু অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা গেছে। এবং হয়ত এ ব্যাপারে আমাদের কিছু অবহেলাও রয়েছে। একটি বিষয় সকলের ক্বলবে গাঁথা উচিত যে, আল্লাহ হচ্ছেন আস-সামাদ, তিনি কোন কজেই আমাদের উপর মুখাপেক্ষী নন, যেটা আল্লাহ ক্বুর'আনে স্পষ্টভাবে বিভিন্ন জায়গায় ঘোষণা করেছেন, বরং সব সময়, সব কাজে আমরাই তাঁর কাছে মুখাপেক্ষী। তাই কেউ যদি আল্লাহর রাস্তায় জান এবং মাল দেয়, এটা তার নিজের জন্যই, এতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কোন মুখাপেক্ষীতা বা প্রয়োজন নেই। তিনি হচ্ছেন আশ-শাকুর; যিনি বান্দাকে আমলে সালিহ করার তৌফীক্ব দান করেন এবং তিনি অতি অল্প আমলের জন্য কাউকে জান্নাতে অতি উচ্চ অবস্থান দান করেন। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য, নতুবা আমাদের সকল প্রচেষ্টা তো অতি সামান্যই, যদি আমরা আল্লাহর রাস্তার নিহতও হই।

আর যদি কেউ জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাদেরকে পরিবর্তন করে অন্য কাউকে নিয়ে আসতে সক্ষম। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

''হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন হতে ফিরে যায়, তবে (এতে ইসলামের কোন ক্ষতি নেই।) কেননা আল্লাহ সত্বরই (তাদের স্থলে) এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে। তারা মুসলিমদের প্রতি মেহেরবান থাকবে, কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, আর তারা কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না; এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন বস্তুত: আল্লাহ প্রাচুর্যদানকারী, মহাজ্ঞানী। ''[সূরা মা'য়িদা(৫): ৫৪

সুযোগের সদ্ব্যবহার না করার ভয়াবহতা (৩)

তাই আমি বিশেষ করে ঐ সমস্ত ভাই এবং বোনদের বলব; যাদেরকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন, তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করে; তাদের সামর্থ অনুযায়ী। যদি তারা আল্লাহ রাস্তায় জান দিয়ে জিহাদ না করতে পারে বা করেও। কেননা জিহাদের জন্য প্রকৃতপক্ষে অনেক বেশী মালের প্রয়োজন হয়। কেননা মুজাহিদদের সামনে এমনও অনেক সময় এসেছে যে, তারা অর্থের অভাবে কাফিরদের উপর হামলা করতে পারেনি এবং অনেক ক্ষেত্রে অর্থের অভাবে অনেক অসমর্থতাও সামনে এসেছে। যেমন খুরাসানের বর্তমান মুজাহিদদের আমির আবু আবদুল্লাহ আতিয়া আল্লাহ আল-লিবিব (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন) তার একই প্রবন্ধে বর্তমানে খুরাসানে জিহাদ পরিচালনার ব্যাপারে কিছু সমস্যা আলোচনা করার পর বলেছেন:

''যেটা উম্মাহর ধনী ব্যক্তিদের বড় অংকের আর্থিক সহযোগীতা না করার কারণে সংঘটিত হয়েছে এবং তাদেরও অবহেলা এর সাথে জড়িত, যাদের দক্ষতার সাথে উম্মাহ পরিচালনার ক্ষমতা রয়েছে এবং যাদের কোন বিশেষ কাজে দক্ষতা রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তাদের বিশেষ দক্ষতার কারণে অন্যান্যদের থেকে পৃথক করেছেন। তাই আমাদেরকে মাল এবং দক্ষ ব্যক্তি দিয়ে সাহায্য করুন এবং আপনারা দেখতে পাবেন কত জিহাদের ফ্রন্ট (ময়দান) এবং ট্রেনিং ক্যাম্প আমরা খুলি এবং আল্লাহর সাহায্যে তাঁর শত্রুদের কি অবস্থা করি। শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই আমরা সাহায্য চাই। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমাদের জন্য উত্তম জিম্মাদার।''

আর এজন্যই ক্বুর'আনের প্রায় সব জায়গায় যেখানে জান দিয়ে জিহাদের কথা এসেছে সেখানে মালের কথাও এসেছে। এর প্রয়োজনীয়তা আমার মত অক্ষম মুসলিমের আর বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। এবং যেসব মালদার ভাই-বোনদের এখন সুযোগ রয়েছে কোন মুজাহিদ পরিবারকে সাহায্য করা বা কোন মুজাহিদ বন্দীকে সাহায্য করা বা তার পরিবারকে সাহায্য করা বা যেসব বোনদের স্বামী আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে তাদের সাহায্য করা, আপনারা কি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই হাদীছ শুনেছেন?

''যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে না, অথবা কোন মুজাহিদকে (জিহাদের সরঞ্জামাদি বা অর্থ দিয়ে) তৈরি করে না, অথবা কোন মুজাহিদের রেখে যাওয়া

পরিবারের খোঁজ খবর রাখে না (বা দেখাশোনা করে না), আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামাতের আগে অকস্মাত আযাব দিয়ে শাস্তি দিবেন''।[সহীহ আবূ দাউদ]

শাইখ্ আবু বাসীর (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন) এই হাদীছের ব্যাপারে বলেন: ''তাই কোন মু'মিনের জন্য উল্লেখিত তিন শ্রেণী ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীতে শামিল হওয়া উচিত নয়: হয় সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে, অথবা কোন মুজাহিদের রেখে যাওয়া পরিবারের খোঁজ খবর রাখবে (বা দেখাশোনা করবে) অথবা কোন মুজাহিদকে আল্লাহর রাস্তায় তৈরি করবে; অন্যথায় সে তার উপর ক্বিয়ামাতের পূর্বেই(আল্লাহর) আযাব আসার অপেক্ষা করুক; আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না এই আযাবের বিষয়বস্তু এবং প্রকৃতি কিরূপ হবে।''

কারণ এখানে শুধু আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ বা কোন মুজাহিদ পরিবারকে সাহায্য করাই মুখ্য বিষয় নয়, বরং এর সাথে এক পুরা মজবুত জিহাদ প্রক্রিয়া জড়িত। একজন মুজাহিদ যখন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে যায়; সে যখন দেখে যে, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় নিহতও হই, তাহলে পিছনে আমার সেইসব আন্তরিক প্রিয় ভাই-বোনেরা রয়েছে, যারা আমার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং পরিবারকে শুধু আর্থিক সহযোগীতা বা দেখা শোনাই নয়, বরং তাকওয়া, সবর এবং ইস্তিক্বামাতের সবকও শিখাবে। এমনকি প্রয়োজনে শহীদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আল্লাহর দিকে দাওয়াহও দেয়ার চেষ্টা করবে। আর যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে একজন মুজাহিদ আল্লাহর রাস্তায় আন্তরিক ভাবে তার জান কোরবান করতে দ্বিধাবোধ করবে। আমরা কি এটা ভেবে দেখেছি!

আমাদের মুজাহিদ শাইখ আনোয়ার আল আওলাক্বী (আল্লাহ তাকে হিফাযাত করুন) তার এক লেকচারে আফসোস করে বলেছেনঃ

''ইয়ামানের এক ভাই আমাকে বলেছেন, কোন এক জন বোনের স্বামী জিহাদে শহীদ হওয়ার পর, সেই বোন আর্থিক অভাবের সম্মুখীন হন, এমনকি সেই বোন ঈদের দিন মানুষের কাছে তার বাচ্চাদের ঈদের জন্য পুরানা জামা-কাপড় তালাশ করছে। ''

আল্লাহু আকবার! হায় আফসোস আমাদের, আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সামনে কি জবাব দেব? আমাদের কি অশ্রুসিক্ত হচ্ছে না! রসূল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবী এবং এইসব ভাইদের রক্তের বিনিময়েই তো আজ আমাদের কাছে ইসলাম এসেছে।

কেননা পূর্বেই বলেছি, আল্লাহ আপনাকে আজ আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করার সুযোগ দিয়েছেন, হয়ত এই সুযোগ সব সময় থাকবে না, হয়ত আর আসবেও না। কেননা কত সময় আছে যে, আমরা আল্লাহর কাছে দো'আ করিঃ হে আল্লাহ আমাকে আপনার রাস্তায় জান এবং মাল দিয়ে জিহাদ করার তৌফিক্ব দ্বান করুন; আর যখন আল্লাহ আমাদের দো'আ ক্ববুল করেন এবং আর আমাদের সামনে এর সুযোগ খুলে দেন, তখন যদি আমরা দ্রুততা এবং আন্তরিকতার সাথে সাড়া না দেই; তখন কি আমাদের সূরা তাওবার এই আয়াত জানা নেই!

''আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে, আল্লাহ যদি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে (প্রচুর সম্পদ) দান করেন, তবে আমরা অবশ্যই খুব দান-খয়রাত করবো এবং সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবো। কার্যত: যখন আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে (প্রচুর সম্পদ) দান করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করতে লাগলো এবং (আনুগত্য করা হতে) তারা গোঁড়ামীর সাথেই বিমুখতা অবলম্বন করলো। সুতরাং আল্লাহ তাদের শাস্তি স্বরুপ তাদের অন্তরসমূহে নিফাক্ব ঢেলে দিলেন, যা আল্লাহর সামনে হাযির হওয়ার দিন পর্যন্ত থাকবে, এই কারণে যে, তারা আল্লাহর সাথে নিজেদের ওয়াদার খিলাফ করেছে, আর এই কারণে যে, তারা (পূর্ব হতেই) মিথ্যা বলছিল।''[সূরা আৎ-তাওবা(৯): ৭৫-৭৭]

এখন সময় এসেছে কথাকে আ'মলে পরিণত করার. . . . . .
আমি আল্লাহর কাছে দো'আ করি, তিনি যেন আমাদের ভাই-বোনদের সিরাতুল মুস্তাক্বিমের উপর দৃঢ় রাখেন, আমাদেরকে নাবী, সিদ্দীক্ব, সালিহীন এবং শুহাদাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আমীন!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪৮৪

কোরবানির মূলশিক্ষা

Umar Faruq

Senior Member

০৮-৩০-২০১৫

কোরবানির মূলশিক্ষা - আল-ওয়ালা ওয়াল বারা

ঈদুল আযহা-র থেকে শিক্ষা নিতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ইতিহাসের পাতায়, ইব্রাহিম (আ) এর ঘটনায়, মিল্লাতে ইব্রাহীম যা আল্লাহ্* আমাদের মানতে নির্দেশ দিয়েছেন।

“অতঃপর আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি যে, ইব্রাহীমের দ্বীন অনুসরণ করুন, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং শিরককারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না”। [সূরা আন-নাহল ১৬-১২৩]

প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ্* তা’আলা বলেছেন যে, যারা মিল্লাতে ইব্রাহীম থেকে দূরে সরে যাবে তারা অজ্ঞ লোক।

“ইব্রাহীমের ধর্ম থেকে কে মুখ ফেরায়? কিন্তু সে ব্যক্তি, যে নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করে”।[সূরা আল-বাকারাহ ২-১৩০]

মিল্লাতে ইব্রাহীমের দুইটি বৈশিষ্ট্য; তা হল আল-ওয়ালা ওয়ালা বারা’। মিল্লাতে ইব্রাহীমকে এই শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

আল ওয়ালাঃ

‘ওয়ালা’ মানে হচ্ছে অনুগত থাকা, ভালবাসা থাকা, সমর্থন করা। তাই যেহেতু আল্লাহ্* আমাদের ইতিমধ্যে নির্দেশ দিয়েই ফেলেছেন, আমাদের উচিত তাঁর প্রতি অনুগত থাকা, তাঁকে ভালবাসা, তা যে ধরনের নির্দেশই হোক না কেন। যদিও কোন কিছুকে উগ্র মনে হয়, যদি আল্লাহ্* নির্দেশ দেন, সামি’না ওয়া আতা’না (আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম)।

প্রথম নিদর্শনঃ

মিল্লাতে ইব্রাহীমের মধ্যে প্রথম অনুগত থাকার যে উদাহরণটি, তা হচ্ছে যখন নবী ইব্রাহীম (আ) তাঁর স্ত্রীকে রেখে যাওয়ার জন্য নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন, যিনি কিনা সদ্য প্রসূত বাচ্চার জন্ম দিয়েছেন, এমন একটি অনুর্বর জায়গায় যেখানে কোন চাষাবাস হয় না।

"হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি"।[সূরা ইব্রাহীম ৩৭]

সাধারণভাবে মনে হয়, তারা হয়তো মারা যেত, তাদের কাছে অল্প কিছুদিনের রসদ ছিল। কিন্তু এটা যেহেতু তাদের প্রতি আল্লাহ্* এর নির্দেশ ছিল তাই সামি'না ওয়া আতা'না, তারা সেখানে থেকে গেল।

যখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন; হে আল্লাহ্*র নবী, আপনি কেন আমাদের এখানে রেখে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? নবী ইব্রাহীম জবাবে বললেন যে এটা আল্লাহ্*র পক্ষ থেকে নির্দেশ। অবশেষে এটা তখন থেকেই আছে যে, আমাদের যমযমের পানি আছে, এবং সেই নির্দেশ সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত সা'ই করা।

দ্বিতীয় নিদর্শনঃ

এবং দ্বিতীয় ওয়ালা হল যখন তাঁর ছেলে বেড়ে উঠলো, কা'বা ঘর নির্মাণ করায় তাঁর বাবাকে সাহায্য করার সমর্থ হল, তাঁর আখলাক ভাল ছিল, তাঁর অবয়বও ভাল ছিল। এরকম ছেলেকে কোন বাবাই বা ভালবাসবে না? একমাত্র ছেলেটি যিনি পরে নবী হয়েছিলেন, ইসমাইল।

তারপর আবার নির্দেশ আসল; আপনার শিশুকে হত্যা করুন! যেহেতু এটা ছিল আল্লাহ্*র নির্দেশ, সামি'না ওয়া আতা'না। কুরআনে এটা এভাবে এসেছে,

"অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইব্রাহীম তাকে বললঃ বৎস! আমি স্বপ্নে দেখিযে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি দেখ। সে বললঃ পিতাঃ! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন"। [সূরা আস-সাফ্*ফাত: ১০২]

সেই মুহূর্তে যখন তিনি বাস্তবিকই তাঁর ছেলেকে মাথা নুয়ে রাখার পর জবাই করতে উদ্যত হলেন, ফেরেশতা জিব্রাইল ইসমাইলের বদলে একটি ভেরা প্রতিস্থাপিত করে দিলেন।

তো কোরবানির শিক্ষা হচ্ছে এখানেই, আমাদের অবশ্যই ওয়ালা মেনে চলার জন্য ত্যাগ করতে হবে। যদি এটা আল্লাহ্*র আদেশ হয়, যেরকম ত্যাগ ই হোক না কেন, সামি'না ওয়া আতা'না। যদিও সাধারণভাবে দেখায় যে, এই আদেশ পালন করতে গেলে মৃত্যু আসতে পারে, যতক্ষণ না আমার শক্তি আছে, আমি সেটা পালন করবই। আসলে, আল্লাহ্*র প্রত্যেকটি আদেশই ভাল, কোন আদেশই ক্ষতিকর নয়।

আল বারাঃ

এবং দ্বিতীয়টি হল বারা'। মুনকার এর মুখোমুখি হওয়াতে নবী ইব্রাহীম ভেঙ্গে পড়েননি। সূরা মুমতাহিনায় এসেছে,

"তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে"।[সূরা আল-মুমতাহানা ৪]

তাই, শিরকের মুখোমুখি বিষয়গুলিতে, কোন নিরবতা নেই। এমনকি নবী ইব্রাহিমও মূর্তি ভেঙেছিলেন, যদিও তাঁর কাজ ছিল দাওয়াহ্* করা। বড় মূর্তিটি ভাঙ্গা হল না, এবং তিনি তাঁর কুঠারটা মূর্তির গলায় ঝুলিয়ে দিলেন।

তাই যদি আমরা তা জানি, আমাদের অবশ্যই সেরকম হতে হবে, যদি আমরা জানি কোন জায়গায় শির্*ক হচ্ছে, আমরা তা ধ্বংস করে দিতে পারি। সেটাই ছিল নবী ইব্রাহীমের আল-ওয়ালা ওয়ালা বারা'।

এবং এটাই হল মিল্লাতে ইব্রাহীম, তাই নবী মুহাম্মদ (স) ও এই নীতির ওপর ছিলেন। নবী মুহাম্মদ (স) কুরাইশের লোকদের দ্বারা মন্দভাবে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। কুরাইশদের ইবাদত হিসেবে মূর্তি পূজা তাদের অনেক পূর্বপুরুষদের

মধ্যেই ছিল, তারপর তারা সকলেই জানল যে নবী (স) এটার বিরোধিতা করছেন, কোন রকম ছাড় ব্যতীত। এ কারনে আবু জাহেল প্রস্তাব করেছিল যাতে রাসুল (সাঃ) নরম হন, সহযোগিতা করেন; তাদের ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী কিছুদিন আল্লাহ্*র উপাসনা করেন, তারপর তারাও তা করবে। আর এ কারনেই সূরা কাফিরুন নাজিল হয়েছিল।

তাই মিল্লাতে ইব্রাহীমের উপাদান হচ্ছে দুইটি; আল-ওয়ালা ওয়ালা বারা', এটাই আমাদেরকে চর্চা করার জন্য বলা হয়েছে। তাই, ঈদুল আযহা শুধু পশু কোরবানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, কারন যা দরকার তা হল তাকওয়া।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আল-ওয়ালা ওয়ালা বারা' এর আকিদাহ বহন করা কারন দুইটার জন্যেই ত্যাগ তিতিক্ষা করতে হবে। এটাই হল ঈদুল আযহার সারমর্ম অর্থাৎ মিল্লাতে ইব্রাহীমের অটল থাকা।

সংগ্রহীত

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫৫৯

সতর্কতার মধ্যম পন্থা

শায়খ আবু মুহাম্মাদ আসিম আল মাকদেসী

Raghib Ansar

Senior Member

০৮-২৭-২০১৫

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আল্লাহ রব্বুল আলামীন ঈমানদারদেরকে আদেশ দিয়ে বলছেন-

হে ঈমানদাররা! তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করো, অতঃপর হয় দলে দলে বিভক্ত হয়ে কিংবা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে অভিযানে বেরিয়ে পড়। (সূরা আন নিসা, আয়াত ৭১)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আরও বলেন-

তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। (সূরা আন নিসা, আয়াত ১০২)

অতএব আল কুরআনের এ সব আয়াত সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, সতর্কতামুলক উপায় অবলম্বন করা, সতর্ক পদক্ষেপ নেয়া, সাবধান থাকা এবং সতর্কতামুলক পদক্ষেপ হিসেবে প্রয়োজনে বিশেষ কোন তথ্য অন্যের কাছ থেকে গোপন রাখা অবশ্যই শরিয়াহ সম্মত; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা ফরয বা আবশ্যক হয়ে দাড়ায় । আর একারণে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে কোন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখার এমন কি তা সামরিক বিষয়াদি না হলেও। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সতর্কতা অবলম্বন কর এবং লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য প্রার্থনা করো, কেননা যে ব্যক্তিই কোন অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয় তাকেই ঈর্ষার পাত্র হতে হয়।

রসুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র শত্রুদের ব্যপারে সতর্কীকরণের ক্ষেত্রে যে সব শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন এক্ষেত্রে তাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

তিনি তামওয়ীহ শব্দ ব্যবহার করেছেন যার অর্থ হল, মেকি, মিথ্যা ঘটনা সাজানো, জালিয়াতি; তিনি ব্যবহার করেছেন মুখাদা'য়াহ যার অর্থ হল বোকা বানানো, ধোঁকা দেয়া, প্রতারণা করা ইত্যাদি। আল্লাহ্র রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্কতা বলতে নিছক স্পর্শকাতর তথ্য গোপন করাকেই বুঝাননি বরং এসব শব্দ তিনি প্রয়োগ করেছেন আগ বাড়িয়ে পরিকল্পিতভাবে শত্রু সেনাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ, মতবিরোধ ও বিভক্তি তৈরী, ফাটল ধরানো, বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করার নির্দেশ দান প্রসঙ্গে। এর প্রধান উদ্দেশ্য শত্রু সেনা ও তাদের গোয়েন্দাদেরকে বিভ্রান্ত করা।

তাবুক যুদ্ধে দুই সাহাবীর অংশগ্রহণ না করা সম্পর্কিত ঘটনা প্রসঙ্গে সহীহ আল বুখারীর বর্ণনায় কা'ব বিন মালেক রাঃ বলেন 'রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোন সেনা অভিযান প্রেরণ করতেন তখন (কোন অঞ্চলে বা কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করবেন সে সম্পর্কে) অভিযান শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সব সময় ভুল তথ্য দিয়ে রাখতেন'।

তিনি তার সাহাবীদের মিশন এবং তার সেনা অভিযানের সফলতার লক্ষে যে সকল বিষয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন তার মধ্যে অন্যতম হল কিতমান বা গোপনীয়তা রক্ষা। যেমন অনেক সময় তিনি কোন দিকে সেনা অভিযান প্রেরণ করতেন কিন্তু স্বয়ং সেই বাহিনীকেও বলতেন না যে তাদের গন্তব্যস্থান কোথায় ও লক্ষবস্তু কি, তিনি তাদেরকে একটি চিঠিতে তাদের গন্তব্য ও লক্ষবস্তুর কথা লিখে দিয়ে নির্দেশ দিতেন যে অমুক স্থানে না গিয়ে বা কোন নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে যেন চিঠিটি না খোলা হয়।

এমনই একটি সেনা অভিযান ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাঃ এর নেতৃতে পরিচালিত সেই অভিযান যে অভিযানে আল হাদরামী নিহত হয়। এ ঘটনা আমাদেরকে স্পর্শকাতর সামরিক তথ্য গোপন রাখার বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়। এবং শুধু সাধারণ জনগণ নয় বরং স্বয়ং মুজাহিদদের থেকেও অপারেশন বা যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তথ্য গোপন রাখার প্রমাণ রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল, মুজাহিদদের কেউ যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, কিংবা কেউ যদি কাফেরদের হাতে বন্দি হয়ে যায় তাহলে সে যেন তাদের কাছে কোন তথ্য ফাস

করে না দিতে পারে , এমনকি তাকে যদি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় তবুও ।

এমন আর একটি ঘটনা হল রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের ঘটনা। যে ঘটনার সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের সারসংক্ষেপ বিশ্লেষণ হল এমন যে-

১) তিনি এমন সময় আবু বকর রাঃ এর কাছে এসেছিলেন যে সময়ে তিনি সাধারনতঃ কখনো আসতেন না।

২) তিনি মুখ ঢেকে আসেন।

৩) সাহাবীদেরকে তার নিজের হিজরতের পূর্বে হিজরত করার নির্দেশ প্রদান; অথচ আবু বকর রাঃ অনুযোগ করে বলেছিলেন 'তারা আপনার অনুসারী! (কিভাবে তারা আপনাকে এই বিপদের মধ্যে রেখে চলে যাবে?)

৪) আবু বকর রাঃ এর পুত্র আব্দুল্লাহ রাতে তাদের সাথে সেই গোপন স্থানে থাকলেও দিন শুরুর পূর্বেই তাদেরকে রেখে আবার মক্কায় চলে আসতেন, যাতে কুরায়শরা ভাবে যে তিনি রাতেও মক্কাতেই ছিলেন। এবং কাফিররা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রাঃ এর বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র করে সে তথ্য সংগ্রহের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। আর রাতের আঁধার নেমে আসার সাথে সাথে তিনি চলে যেতেন সেই পাহাড়ের গুহায় যেখানে তারা লুকিয়ে থাকতেন এবং তাদেরকে সকল বিষয়ে অবহিত করতেন ।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাঃ এর বর্ণনায় সহীহ আল বুখারীতে ৩৯০৫ নং হাদিসে হিজরতের যে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণীত রয়েছে সেখানে আমাদের এখানে আলোচিত প্রত্যেকটি বিষয় পাওয় যাবে । সে বর্ণনায় এও রয়েছে যে পথিমধ্যে সুরাকার সাথে দেখা হলে রসুলল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন যে, 'আমাদের বিষয়টি অন্যদের থেকে গোপন রেখো'।

সহীহ আল বুখারীতে 'যুদ্ধ মানেই ধোঁকা' শিরোনামে একটি স্বৎযঙ্ অধ্যায়ই রয়েছে; আর উল্লেখিত এ হাদিসটি সে অধ্যায়েই সংকলিত । হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী এ হাদিসে উল্লেখিত ধোঁকার ব্যাখ্যায় বলেন 'ধোঁকা অর্থ হল কোন এক জিনিস প্রকাশ করে তার অন্তরালে অন্য জিনিস গোপন রাখা। এ হাদিসে

যুদ্ধে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রতারণামূলক কাজ করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। আর যে ব্যক্তি তার শত্রুদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান রাখে না এবং যে এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নয় সে তার চারপাশের ঘটনা প্রবাহ তার বিরুদ্ধে চলে যাওয়া থেকে মোটেই নিরাপদ নয়।

ইমাম বুখারী রহঃ 'যুদ্ধে মিথ্যা বলা' নামে আরও একটি অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন, আর এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন ইহুদী তাগুত কা'ব বিন আশরাফকে সাহাবায়ে কেরাম রাঃ কিভাবে হত্যা করেছিলেন। তারা তাকে মিথ্যা কথা বলে এমনভাবে বিভ্রান্ত করেছিলেন যে সে ভাবছিল যে সাহাবায়ে কেরামগন সত্যিই আল্লাহ্র রসুলের উপর চরমভাবে বিরক্ত, আল্লাহ্র রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাদের উপর আরপিত দান সাদাকা করতে করতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এভাবে তার সাথে তারা মিথ্যা মিথ্যি কথা বলতে থাকে যতক্ষণ না তারা তাকে সম্পূর্ণরূপে বাগে আনতে পেরেছিলেন এবং অতঃপর আল্লাহ্র এ দুশমনকে তারা হত্যা করে ফেলেন ।

হাফেজ ইবনে হাজার এই হাদিসের ব্যখ্যায় তার ফতহুল বারী গ্রন্থে তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলার বৈধতা প্রসঙ্গে অন্য আরও একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যে হাদিসটি ইমাম তিরমিযী রহঃ তার সুনানে উম্মে কুলসুম রাঃ এর বর্ণনায় সংকলণ করেছেন। এই তিনটি ক্ষেত্রের একটি হল যুদ্ধ। হাফিজ ইবনে হাজার রহঃ হাজ্জাজ ইবনে ইলাতের ঘটনাটিও সেখানে উল্লেখ করেছেন যেখানে দেখা যায় হাজ্জাজ ইবনে ইলাত তার সম্পদ মক্কার লোকদের কাছ থেকে ফেরত পাওয়ার জন্য রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মিথ্যা বলার অনুমতি প্রার্থনা করেন।

ইমাম বুখারী রহঃ ৩৮৬১ নং হাদিসে হযরত আবু যার রাঃ এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলেও আমরা সতর্কতা অবলম্বন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। আর এ ঘটনা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে সাহাবায়ে কেরাম রাঃ যে কোন কাজে নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন, সতর্ক থাকতেন এবং সব সময় যত্নের সাথে গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতেন; নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণকে কখনো তারা অবহেলা করতেন না। আবু যার রাঃ এর এ ঘটনায় আমরা দেখতে পাই আলী রাঃ সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত

নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে কিছু না বলে কিভাবে টানা তিন দিন পর্যন্ত তাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি অপেক্ষা করেছেন তার আগমনের উদ্দেশ্য তার থেকে না জানা পর্যন্ত; এভাবে তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়েছেন যে তিনি সত্যিই ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র রসুলের সাথে সাক্ষাত করতেই এসেছেন। এরপরি তিনি সম্মত হন তাকে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে যেতে এবং তাকে বলেন দূর থেকে তাকে অনুসরণ করতে যাতে কুরায়শরা কিছু টের না পায়। আমরা দেখতে পাই কত সতর্কভাবে আলী রাঃ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন! তিনি আবু যার রাঃ কে বলেন 'আমি যদি আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন কোন কিছু আঁচ করি তাহলে আমি প্রশ্রাব করার ভান করে রাস্তার পাশে চলে যাবো; এর পর যখন আমি আবার চলা আরম্ভ করবো আপনি আমাকে অনুসরণ করে চলতে থাকবেন যতক্ষণ না আপনিও সেই বাড়িতে প্রবেশ করেন যে বাড়িতে আমি প্রবেশ করি'।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তা'য়ালা আসহাবে কাহাফের ঘটনায় আমাদেরকে দেখিয়েছেন কিভাবে সেই যুবকরা তাদের জাতির লোকদের থেকে সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। তাদের মধ্য থেকে যাকে তারা খাবার ক্রয় করতে শহরে পাঠিয়েছিলেন তাকে তারা বলেছিলেন-

তোমরা তোমাদের একজনকে তোমাদের পয়সা দিয়ে বাজারে পাঠাও, সে গিয়ে দেখুক কোন খাবার উত্তম,অতঃপর তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসুক; সে যেন অবশ্যই বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে এবং তোমাদের ব্যাপারে কাউকে কিছু না বলে। (সুরা আল কাহাফ, আয়াত ১৯-২০)

এখানে উল্লেখিত এবং এমন অন্য আরও অনেক ঘটনা প্রমাণ করে যে, সাবধানতা অবলম্বন, সতর্কতা মুলক পদক্ষেপ গ্রহণ, গোপনীয়তা বজায় রাখা, আল্লাহর শত্রুদের কাছে বানোয়াট ঘটনা সাজানো, তাদেরকে প্রতারিত ও বিভ্রান্ত করা, তাদের দুষ্কৃতি থেকে নিজেদেরকে রক্ষার জন্য মিথ্যা কথা বলা সম্পূর্ণভাবে শরিয়াহ সম্মত হালাল ও বৈধ এবং একারণে কোন মুসলমানকে কিছুতেই দোষারোপ কিংবা ভর্তসনা করা যাবে না। আর একথা অনস্বীকার্য সত্য যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হালাল করে দেয়া এ সুযোগকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা, সাবধানতা অবলম্বনের এসব পদক্ষেপকে অবহেলা আল্লাহ্র শত্রুদেরকে দ্বীনের

দায়ী ও মুজাহিদদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেবে এবং কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে নস্যাত করে দেবে, তাদের জান মাল কোরবানি করে পরিচালিত জিহাদকে বিফল করে দেবে।

শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির বৈধতা প্রমানিত হওয়ার পর এখন আমরা এর বাস্তব প্রয়োগের ব্যপারে কিছু আলোচনা করবো।

সাবধানতা অবলম্বনের ব্যপারে লোকেরা উভয় দিকেই প্রান্তিকতার শিকার; একদল হয়তো সতর্কতার ব্যপারে এমন মারাত্নক উদাসীন যে বিষয়টিকে মোটেই গুরুত্ব দেয় না; অন্য দিকে একদল সতর্কতার নামে এমন বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে যে সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে একেবারে স্থবির হয়ে বসে আছে, ভীতি তাদের অন্তরে এমনভাবে ছেয়ে গেছে যে তারা তাদের নিজ ছায়া দেখেও ভয়ে কেপে ওঠে, তারা মনে করে আশপাশের সব কিছু বুঝি শুধু তারই বিরুদ্ধে কাজ করছে। কাজ আরম্ভ করার প্রথম দিকে নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টিকে অবহেলা হেতু তাদের উপর আপতিত বিপদ মুসীবতের কারণে তারা দাওয়াহ ও জিহাদের কাজ ছেড়ে দিয়ে ঘরের কোণে ঘাপটি মেরে অলস হয়ে বসে থাকে। এবং মানসিক দিক থেকে এমনভাবে ভেঙ্গে পড়ে যে তারা মনে করে তাদের সকল গোপন তথ্য বুঝি আল্লাহ্র শত্রুদের জানা। আল্লাহ্র শত্রুদের আড়ি পাতা, দলের মধ্যে গোপন অনুপ্রবেশ, গোপন পর্যবেক্ষণ, তাদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ইত্যাদির ভয়ে সে এমনভাবে কুঁচকে যায় যে সে ফোন, কম্পিউটার বা অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার একেবারেই ছেড়ে দেয়। তার অবস্থা এমন হয়ে দাড়ায় যে সে যদি যোগাযোগের জন্য বার্তাবাহক হিসেবে কবুতর ব্যবহার করতে পারতো তাহলে অন্য কিছুই ব্যবহার করতো না।

অথচ এসব তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা সত্ত্বেও নিজেকে এর ক্ষতিকারক দিক থেকে নিরাপদ রাখার জন্য এমন কোন মহা পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, সামান্য একটু সচেতনতাই এথেকে আপনাকে নিরাপদ রাখতে পারতো। এজন্য আল্লাহ্র শত্রুদের বিভ্রান্ত করার কিছু পদ্ধতি জানা, নিপুন কভার স্টোরি তৈরি করতে শেখা, তথ্য গোপন রাখার প্রযুক্তিগত আধুনিক কিছু টেকনিক শিখে নেয়া প্রতিটি মুজাহিদ ভাইয়েরই একান্ত কর্তব্য। এর ফলে দেখা যাবে আল্লাহ্র ইচ্ছায় যাদুকর তার নিজ যাদুতেই আক্রান্ত হয়ে পড়বে।

‘সব কিছুই তাদের পর্যবেক্ষণের আওতাধীন’ এমন কথা বলে কিংবা তাদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আধুনিক এসব উপায় উপকরণসমুহকে দাওয়াহ ও জিহাদের কাজে ব্যবহার বন্ধ করে দেয়া, যৌক্তিক কোন বৈধ কারণ ছাড়া আধুনিক এসব যোগাযোগ মাধ্যমসমুহকে উপেক্ষা করা সেচ্ছায় পরাজয় বরণ করা ও আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছুই নয়। এর অর্থ দাঁড়াবে আল্লাহ্র শত্রুদের বোগাস সব প্রযুক্তির সামনে অকারণ ভেংগে পড়া এবং আল্লাহ্র শত্রুদের ‘ক্ষমতাকে’ বাড়াবাড়ি পর্যায়ে অতি মুল্যায়ন করা।

জেলের কষ্টকর জীবন থেকে সদ্য মুক্তি পাওয়া কয়েকজন যুবকের সাথে আমি দেখা করেছিলাম যারা জেলে থাকা অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদের সময় একে অপরের বিরুদ্ধে জবানবন্দি দিয়েছে। এদের এক জনের সাথে কথা বলার জন্য যখন আমি বসলাম তখন সে উঠে গিয়ে রেডিওর একটি চ্যানেল ছেড়ে দিল যাতে শুধু উচ্চস্বরে বিরক্তিকর শব্দ হচ্ছিল, আমি তাকে বললাম, তুমি রেডিও ছাড়ছো কেন, ওটা বন্ধ করে দাও, শব্দে তো কিছু শোনা যাচ্ছে না! সে বলল, না এটা বন্ধ করা যাবে না, আমাদের কথোপকথনকে অবোধগম্য করার জন্য এর প্রয়োজন আছে, যদি কেউ আমাদের কথাবার্তায় আড়ি পাতে? আমি তাকে বললাম, এটা তোমার নিজের ঘর, আর আমাদের কথাবার্তা একান্তই সাধারণ সামাজিক কথাবার্তা, আমরা না দাওয়াহর বিষয়ে কথা বলছি না জিহাদের, না নিরাপত্তা বিষয়ক কোন ব্যপারে; আমার তো মনে হয় তোমার এই রেডিওর অপ্রাসঙ্গিক শব্দ বরং অন্যদের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক করা ছাড়া অন্য কোন উপকারে আসবে না।

এদের অনেককে দেখা যায় এরা কারো সাথে ফোনে কথা বলার সময় কোন প্রয়োজন ছাড়াই এমন সব বিকৃত ও সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করে যে শুনে মনে হয় যে সে অন্য কোন ভাষায় কথা বলছে, অনেক সময় দেখবেন আপনি বুঝতেই পারবেন না এরা কি বলছে; অথচ তাদের আলোচনার বিষয় বস্তু হয়তো ছিল এমন একান্তই সাধারণ যেক্ষেত্রে এরকম সন্দেহজনক আচরণের কোনই প্রয়োজন ছিল না। আল্লাহ্র শত্রুরা যদি সত্যিই তাদের এসব সন্দেহজনক সাংকেতিক কথাবার্তা আড়ি পেতে শুনে থাকে তাহলে তারাও হয়তো বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নিবে, হয়তো ভাববে যে এই সাংকেতিক কথাবার্তার পেছনে নিশ্চই নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার আক্রমনের চেয়েও ভয়াবহ কোন আক্রমনের পরিকল্পনা লুকিয়ে আছে।

আমাদের বুঝা উচিত যে সন্দেহজনক ভঙ্গিতে কথা না বলে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলাই উত্তম; অকারণ সন্দেহ সৃষ্টি করা মোটেই ঠিক নয়। এতদসত্ত্বেও কিছু লোক আছে যারা বিনা কারণেই এমন সন্দেহজনক আচরণ করতে পছন্দ করে। দেখা যায় এদের কেউ হয়তো আপনাকে ফোন করে বললো যে 'আপনার কাছে আমার একটা আমানত আছে' কিংবা বললো, 'আপনি আজ অবশ্যই আসবেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ আছে'। হয়তো দেখা যাবে গুরুত্বপূর্ণ আমানতটি হল এক প্যাকেট চকলেট বা কোন কাপড় চোপড়, বা এক জোড়া সানগ্লাস যেটা তার থেকে আপনি হয়তো ধার নিয়েছিলেন; আর মহা গুরুত্বপূর্ণ সেই কাজটি হল এক সাথে আনন্দ করে লাঞ্চ বা ডিনার করা। এরা অকারণ অস্পষ্টতা ও নাটকীয়তা পছন্দ করে। এই বোকারা অনুধাবন করেনা যে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এই স্থুল নাটকীয়তা কত ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনতে পারে। বিশেষ করে যাদের সাথে এভাবে কথা বলছে তারা যদি এমন ব্যক্তি হন যাদেরকে সরকারী গোয়েন্দারা পর্যবেক্ষণ করছে, যাদেরকে আল্লাহ্র শত্রুরা মনিটর করছে।

এরা যদি কখনো কারাবন্দি হয় তাহলে শত কসম করে বললেও আল্লাহ্র শত্রুরা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না যে সেই আমানতটি ছিল একান্তই তুচ্ছ কোন জিনিস, আর সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা ছিল নিছক লাঞ্চ বা ডিনার। তারা একথা বললে কিছুতেই তাদেরকে ছাড়বে না, তারা তাদের শরীর ক্ষত বিক্ষত করবে, তাদের নখ উপড়ে ফেলবে যতক্ষন না তারা 'স্বীকার' করবে যে তাদের অস্ত্রসস্ত্র ও গোলা বারুদের মজুদ কোথায় লুকানো আছে; যতক্ষণ না তারা 'গোপন সামরিক মিটিং' কিংবা 'সংগঠনের' গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়ার ব্যাপারে জবানবন্দি দিতে সম্মত হয় যা সেই সাংকেতিক কথার আড়ালে লুকিয়ে আছে।

কিছু লোক আছে যারা সামান্য নির্যাতনের মুখোমুখি হওয়ার আগেই আল্লাহ্র শত্রুদের কাছে সব কথা গড়গড় করে বলে দেয়, সবার কন্টাক্ট নাম্বার দিয়ে দেয় এবং অজুহাত দেয় যে তারা শুনেছে নতুন এক ধরণের প্রযুক্তি এসেছে যার সাহায্যে মানুষের কণ্ঠস্বর সনাক্ত করা যায়, মিথ্যা শনাক্তকারী মেশীনের সাহায্যে কেউ মিথ্যা বললে তাও ধরে ফেলা যায় এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দুনিয়ার সকল ফোনের কথোপকথন রেকর্ড করা হয়... ইত্যাদি ইত্যাদি। কথা শুনে মনে হয় যেন তারা ব্যপক গন বিধ্বংসী অস্ত্রের বিষয়ে কথাবার্তা বলছিল। এসব

হাইপোথেটিক চিন্তা করে গোয়েন্দাদের কাছে তারা মিথ্যা কথা বলাকে সমীচীন মনে করে না।

আমি বুঝি না এর চেয়ে ভয়াবহ ক্ষতি আর কি হতে পারে যে আল্লাহ্র শত্রুরা তাকে শনাক্ত করতে পেরেছে এবং তারা এও বুঝতে পেরেছে যে সে তাদের কাছে মিথ্যা বলছে। নাকি সে তাদের থেকে নিরীহ সাধারণ ও অমায়িক ভদ্রলোক হওয়ার সার্টিফিকেট চায়! নাকি সে মিথ্যা বলতে লজ্জাবোধ করছে সেই সব লোকদের কাছে যারা সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিশ্বাসঘাতক ও পথভ্রষ্টকারী! অথচ তার এই মিথ্যা হয়তো আল্লাহ্র দ্বীনের দাওয়াহ ও জিহাদকে আল্লাহ্র শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করতে পারতো, তাকে ও তার দ্বীনী ভাইদেরকে তাদের যুলুম অত্যাচার থেকে বাঁচাতে পারতো। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র শত্রুদের এই জঘন্য মিথ্যাচার তো দ্বীনের দাওয়াহকে বন্ধ ও জিহাদকে উৎখাত করার জন্য; তার দ্বীনী ভাইদের উপর দমন পীড়ন ও যুলুম নির্যাতন চালানোর জন্য।

এই হল আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও আল্লাহ্র শত্রুদের ক্ষমতা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণা পোষণ করা, তাদেরকে খুব ভয় করা এবং তাদেরকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে বোকার মতো অপ্রয়োজন অতি বাড়াবাড়ি করার পরিণাম।

এতো গেল আমাদের এক শ্রেনীর ভাইদের অবস্থা, অন্য দিকে রয়েছে আমাদের সে সব ভাইয়েরা যারা সাবধানতা অবলম্বন ও নিরাপত্তা ইস্যুকে মোটেই গুরুত্ব দেয় না। দেখা যায় যে তারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য, গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ও স্থানের নাম, সংগঠনের সদস্যদের নাম ঠিকানা, তাদের পরিকল্পনা, তাদের অর্থের উৎস, খরচের খাত ইত্যাদি সব কোন রকম সিকিউরিটি কোড ছাড়াই প্রকাশ্যে ও সাধারণ বোধ্য ভাষায় বিস্তারিত লিখে রাখে; অথচ আমরা তথ্য প্রযুক্তির এমন উন্নতির যুগে বাস করছি যেখানে তথ্য গোপন রাখার অনেক রকম নিরাপদ ও আধুনিক পদ্ধতি আমাদের হাতের নাগালে রয়েছে।

এসব ভাইদেরকে দেখা যায় সাংগঠনিক, নিরাপত্তা সংক্রান্ত বা গুরুত্বপূর্ণ কোন বার্তা তার কাছে আসার পর সে সেটিকে দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ পকেটে নিয়ে ঘুরছে, কিংবা তার ঘরে হয়তো মাসের পর মাস বসরের পর বসর ধরে পড়ে আছে অথচ সে তা নষ্ট রে ফেলছে না। যেন সে অপেক্ষা করছে কখন আল্লাহ্র শত্রুরা আকস্মিক তার বাড়িতে হানা দেবে আর দাবি করবে যে 'ভয়াবহ

সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা' তারা নস্যাত করে দিয়েছে; আর সেও সেই অরক্ষিত অবহেলায় ফেলে রাখা তথ্যটির কারণে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তা অস্বীকার করার সুযোগ পাবে না, আর এটিই তার বিরুদ্ধে ভয়াবহ সন্ত্রাসী কাজে সম্পৃক্ততার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

এর চেয়েও যে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারে তা হল তার এই অসতর্কতার কারণে অনেক ভাইয়েরা গ্রেফতারের শিকার হতে পারে, দাওয়াহ ও জিহাদের কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এদেরকে দেখা যায় কোন রকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া নির্বিঘ্নে সব ধরণের যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে চলছে, আর কেউ যদি তাকে সাবধান হওয়ার পরামর্শ দেয়, কোন মিটিঙের বিষয়বস্তু গোপন রাখতে বলে, বার্তাটি পড়ার পর যদি চিরকুটটি ছিড়ে ফেলতে বলে, ভাইদের আসল নাম ঠিকানা না রাখতে বলে এবং তাকে সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে বলে তখন সে বিরক্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, কল্যাণকামী ভাইদেরকে গালমন্দ করে; এমনকি এগুলোকে লজ্জস্কর, দুঃখজনক ও কাপুরুষতা বলে আখ্যায়িত করে।

আমি জানি না তার মধ্যে কেমন প্রতিক্রিয়া হতো যদি সে আফগানিস্তানের সেই দৃশ্য দেখত যখন সাপের গর্তে ভরা এবং দুজন মানুষের জন্য জায়গা হয় না এমন সংকীর্ণ গুহার মধ্য তার অনেক মুজাহিদ ভাইদেরকে লুকিয়ে থাকতে হয়েছে।

সত্যিই এমন ব্যক্তিকে ভর্তসনা করাটা কোন অন্যায় নয় যে দুর্দশায় পতিত হওয়ার একমাত্র কারণ হল আল্লাহ্র রসুলের জীবনী সম্পর্কে তার অসচেতনতা, আরাম আয়েশের মধ্যে ডুবে যাওয়া, আল্লাহ্র দ্বীনের জন্য একজন সত্যিকার মুজাহিদ হিসেবে সৈনিক সুলভ জীবন যাপন থেকে দূরে থাকা এবং দুনিয়াদার সাধারণ মানুষদের মতো তাগুতদের প্রচারিত তথাকথিত নিরাপদ জীবনের কুহেলিকায় ডুবে থাকা।

কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ তিতিক্ষা ও সাধনা করে সফলতার দ্বার প্রান্তে আনা অনেক পরিকল্পনা কেবল এই অসতর্কতা, অসাবধানতা ও বেখেয়ালীপনার কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং মুসলিমদেরকে হতাশার মধ্যে ফেলেছে; একই সাথে আল্লাহ্র শত্রুদের জন্য এ ঘটনা বয়ে এনেছে এক মহা আনন্দ বার্তা, তারা

এটাকে 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে' তাদের নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার বিরাট সাফল্য হিসেবে জনগণের সামনে তুলে ধরছে। অথচ বাস্তবে বিষয়টি হয়তো মোটেই তা নয়, এই ব্যর্থতা আল্লাহ্র শত্রুদের গোয়েন্দাদের কোন সফলতা ছিল না, বরং এটা ছিল ভাইদের অসতর্কতা, অসাবধানতা ও নিরাপত্তা ইস্যুকে যথাযথ গুরুত্ব না দেয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

আমার সত্যি কষ্ট হয় যখন দেখি অনেক যুবকেরা এ বিষয়ে উপদেশ গায়ে মাখে না, অন্যদের ভুল থেকে শিক্ষা নেয় না এবং একই ভুল বারবার করতে থাকে; আর একারণে একই পরিণতির শিকার হয়। এদের কেউ যখন জিহাদে অংশগ্রহণ করার নিয়ত করে এবং এ উদ্দেশ্যে যদি কিছু অস্ত্রশস্ত্র এদের হস্তগত হয় তাহলে সে অন্যদের কাছে কেবল অস্ত্রের কথা বলেই ক্ষান্ত হয় না বরং তার লক্ষ উদ্দেশ্য ও জিহাদের পরিকল্পনা ইত্যাদি বলতে গর্ব বোধ করে। তারপর যখন আকস্মিকভাবে তাকে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় কিংবা তার বাড়ি রেইড দেয়া হয় তখন সে ভাবে কিভাবে তার পরিকল্পনা তারা জেনে গেলো!

এটা সত্যিই দুঃখজনক যে আমরা দ্বীনী বিষয়ে যে নিয়ম শৃঙ্খলা পালন করতে পারি না, দেখা যায় দুনিয়াবী বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠন সে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে। সশস্ত্র সংগঠনের নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলা, গোপন সংগঠনের মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা অনেক সচেতন। আপনি দেখবেন কোন অপারেশন চালানোর ক্ষেত্রে তারাও চূড়ান্ত গোপনীয়তা বজায় রাখে, তারা কাউকে কিছু জানায় না, এমনকি স্বয়ং যারা অপারেশন চালাবে তাদেরকেও প্রয়োজনের চেয়ে বেশী কিছুই বুঝতে দেয়া হয় না। অপারেশনে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কেও কাউকে কিছু টের পেতে দেয় না, এমন কি কোথায় অপারেশন চালাবে তাও জানানো হয় কেবল অপারেশনের একান্ত পূর্ব মুহূর্তে। যারা অপারেশন চালায় তারা পর্যন্ত প্রয়োজনের চেয়ে বেশী কিছুই জানে না, অপারেশন বাস্তবায়নের জন্য ঠিক যতটুকু না জানলেই নয় ঠিক ততটুকুই কেবল জানে। তারা জানে না অর্থায়ন কে করে, অস্ত্র কোত্থেকে আসে, অস্ত্রের মজুদ কোথায়, কে এটা আমদানি করেছে, কে বহন করে এনে দিয়েছে, অন্য সদস্যরা অন্য কোথাও আক্রমনের প্রস্তুতি নিচ্ছে কি না। এ ধরণের প্রতিটি স্তর হল একেকটা নিরাপত্তা চাদর; এসব বিশেষ তথ্যের ব্যাপারে সংগঠনের কোন সদস্যের উচিত নয় অযাচিত প্রশ্ন করা কিংবা অনধিকার চর্চা করা। যে ব্যক্তি তার নিজ সামরিক কার্যক্রমের প্রতি শ্রদ্ধা রাখে সে কিছুতেই এ ধরণের

স্পর্শকাতর তথ্য যাকে না জানালেই নয় তাকে ছাড়া অন্য কাউকে দিতে পারে না। একারণে দেখা যায় এই ধরণের কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে যেসব অপারেশন পরিচালনা করা হয় তার ব্যর্থতার আনুপাতিক হার খুবই কম। অন্য দিকে দেখা যায় সশস্ত্র সংগঠনের নিয়ম শৃঙ্খলার কঠোরতা সম্পর্কে কোন রকম ধারণা না নিয়ে দরবেশ গোছের বোকা ও নির্বোধ লোকেরা এসব সংগঠনে যোগ দিয়ে এমন ভয়াবহ রকম আত্মঘাতি ভুল করে বসে যে তার কারণে গোটা সংগঠনের কার্যক্রম ও এর সদস্যদের জীবন হুমকির মুখে পড়ে যায়। অথচ নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা, সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ, সাবধানতা অবলম্বন ও গোপনীয়তা বজায় রাখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গোটা মানবজাতির সামনে মুসলিমদের হওয়া উচিত ছিল অনুসরনীয় আদর্শ। কেননা তাদের মহান আদর্শ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীদের জীবনে এ বিষয়ের উপর শিক্ষণীয় এতো উদাহরণ রয়েছে যা গুনে শেষ করা যাবে না; যার কয়েকটি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আসলে আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য প্রয়োজন চিতাবাঘের মতো ক্ষিপ্র ও বাজ পাখির মতো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষের; সুফী দরবেশ আর তোতা পাখির কোন প্রয়োজন এখানে নেই।

অসাবধানতার আর একটি উদাহরণ হল জাহেলী সময়ের মতো অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ানো। অনেক যুবককে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে হেদায়াত দান করার পরও দেখা যায় জাহেলী সময়ে সে যেমন অস্ত্রের বরাই দেখিয়ে বেড়াতো তেমনি এখনো সে একই রকম আচরণ করে যাচ্ছে। আগেও যেমন প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াতো এখনো তেমনি করে চলছে। সে জানে না তার পূর্বেকার জীবনের সাথে এই জীবনের কতো বিস্তর ফারাক রয়েছে, সে জানে না আল্লাহ্র শত্রুরা তাকে আগে যে দৃষ্টিতে দেখত এখন তার মুখে দাড়ি গজানোর পর কিন্তু আর সেই একই দৃষ্টিতে দেখবে না। সে নতুন যে সব লোকের সাথে এখন চলা ফেরা করে, যাদের সাথে যোগাযোগ রাখে তাদের সংস্পর্শে আসার পর আল্লাহ্র শত্রুদের দৃষ্টিভঙ্গি তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যাবে। অথচ এদেরকে যদি সাবধানতা অবলম্বনের উপদেশ দেয়া হয় এরা সাবধানতাকে কাপুরুষতা ও দুর্বলতা বলে উড়িয়ে দেয়। এরপর এই অসাবধানতার কারণে যখন সে জেলে যায়, রিমান্ডের মুখোমুখি হয় তখন আর বিষয়টা সাধারণ থাকে না; এ ধরণের লোকেরা যখন একবার বিপদে পড়ে তখন মানসিক দিক থেকে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। এরপর এই 'দুঃসাহসী বীর

বাহাদুররা' তাদের নিজ ছায়াকেও ভয় পেতে শুরু করে, জিজ্ঞাসাবাদের আধুনিক প্রযুক্তির সামনে একাবারে ভেঙ্গে পড়ে, আল্লাহ্র শত্রুদের চতুর গোয়েন্দা সংস্থা ও তাদের ক্ষমতার সামনে সে একেবারে কুঁচকে যায়। সে তার নিজের অসাবধানতা ও বোকামির কথা ঢাকতে গিয়ে আল্লাহ্র শত্রুদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, তাদের গোয়েন্দা সংস্থার চতুরতা ও ক্ষমতার গুণকীর্তন আরম্ভ করে দেয়।

চূড়ান্ত কথা হল সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বনকে যেমন মোটেই উপেক্ষা করার সুযোগ নেই তেমনি অতি সতর্কতার নামে আল্লাহ্র পথে জিহাদ ছেড়ে দিয়ে স্থবির হয়ে বসে থাকারও কোন সুযোগ নেই। বরং সকল ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত মধ্যম পন্থা অবলম্বনই বাঞ্ছনীয়। এ পথের সঙ্গীদেরকে জিহাদের রক্ত পিচ্ছিল পথ পাড়ি দিতেই হবে; অতএব তাদের শত্রুদের পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে শিথিলতা ও বাড়াবাড়ির উভয় প্রান্তিকতাকে পরিহার করে যথাযথ নিরাপত্তামুলক সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বনের কোন বিকল্প নেই।

আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি যেন তিনি তার বন্ধুদের বিজয় দান করেন এবং তা শত্রুদের লাঞ্ছিত করেন।

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সব সময়ই বিজয়ী, যদিও অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।

(সুরা ইউসুফ, আয়াত ২১

কমেন্ট

titumir

Senior Member

০৮-৩০-২০১৫

হে ঈমানদাররা! তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করো, অতঃপর হয় দলে দলে বিভক্ত হয়ে কিংবা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে অভিযানে বেরিয়ে পড়। (সূরা আন নিসা, আয়াত ৭১)

অথচ এসব তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা সত্ত্বেও নিজেকে এর ক্ষতিকারক দিক থেকে নিরাপদ রাখার জন্য এমন কোন মহা পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, সামান্য একটু সচেতনতাই এথেকে আপনাকে নিরাপদ রাখতে পারতো। এজন্য আল্লাহ্র শত্রুদের বিভ্রান্ত করার কিছু পদ্ধতি জানা, নিপুন কভার স্টোরি তৈরি করতে শেখা, তথ্য গোপন রাখার প্রযুক্তিগত আধুনিক কিছু টেকনিক শিখে নেয়া প্রতিটি মুজাহিদ ভাইয়েরই একান্ত কর্তব্য। এর ফলে দেখা যাবে আল্লাহ্র ইচ্ছায় যাদুকর তার নিজ যাদুতেই আক্রান্ত হয়ে পড়বে।

'সব কিছুই তাদের পর্যবেক্ষণের আওতাধীন' এমন কথা বলে কিংবা তাদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আধুনিক এসব উপায় উপকরণসমুহকে দাওয়াহ ও জিহাদের কাজে ব্যবহার বন্ধ করে দেয়া, যৌক্তিক কোন বৈধ কারণ ছাড়া আধুনিক এসব যোগাযোগ মাধ্যমসমুহকে উপেক্ষা করা সেচ্ছায় পরাজয় বরণ করা ও আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছুই নয়। এর অর্থ দাঁড়াবে আল্লাহ্র শত্রুদের বোগাস সব প্রযুক্তির সামনে অকারণ ভেংগে পড়া এবং আল্লাহ্র শত্রুদের 'ক্ষমতাকে' বাড়াবাড়ি পর্যায়ে অতি মুল্যায়ন করা।

আমার সত্যি কষ্ট হয় যখন দেখি অনেক যুবকেরা এ বিষয়ে উপদেশ গায়ে মাখে না, অন্যদের ভুল থেকে শিক্ষা নেয় না এবং একই ভুল বারবার করতে থাকে; আর একারণে একই পরিণতির শিকার হয়। এদের কেউ যখন জিহাদে অংশগ্রহণ করার নিয়ত করে এবং এ উদ্দেশ্যে যদি কিছু অস্ত্রশস্ত্র এদের হস্তগত হয় তাহলে সে অন্যদের কাছে কেবল অস্ত্রের কথা বলেই ক্ষান্ত হয় না বরং তার লক্ষ উদ্দেশ্য ও জিহাদের পরিকল্পনা ইত্যাদি বলতে গর্ব বোধ করে। তারপর যখন আকস্মিকভাবে তাকে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় কিংবা তার বাড়ি রেইড দেয়া হয় তখন সে ভাবে কিভাবে তার পরিকল্পনা তারা জেনে গেলো!

আসলে আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য প্রয়োজন চিতাবাঘের মতো ক্ষিপ্র ও বাজ পাখির মতো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষের; সুফী দরবেশ আর তোতা পাখির কোন প্রয়োজন এখানে নেই।

সে তার নিজের অসাবধানতা ও বোকামির কথা ঢাকতে গিয়ে আল্লাহ্র শত্রুদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, তাদের গোয়েন্দা সংস্থার চতুরতা ও ক্ষমতার গুণকীর্তন আরম্ভ করে দেয়।

আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি যেন তিনি তার বন্ধুদের বিজয় দান করেন এবং তা শত্রুদের লাঞ্ছিত করেন।

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সব সময়ই বিজয়ী, যদিও অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।

(সুরা ইউসুফ, আয়াত ২১)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫৪৬

কুরআনের আলোকে ইবাদুর রহমানের পরিচয় ও গুণাবলী

In-sha-Allah-Shohid

Junior Member

০৯-২৫-২০১৫

হে আল্লাহ ,আমাদের মাঝে যে বিষয় গুলোর ঘাটতি আছে সে গুলো পূরণ করার তৌফিক দান করুন আমীন।

আল্লাহ তা'আলা সূরা ফুরকানের ৬৩-৭৪ আয়াত পর্যন্ত তার বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের ১২টি গুণের কথা বলেছেন। এগুলোর মধ্যে বিশ্বাস, সংশোধন, দৈহিক ও আর্থিক যাবতীয় ব্যক্তিগত কর্মে আল্লাহ ও রাসূলের বিধান ও ইচ্ছার অনুসরণ, অপর মানুষের সাথে সামাজিকতা ও সম্পর্ক স্থাপনের প্রকারভেদ, দিবারাত্রি এবাদত পালনের সাথে আল্লাহভীতি যাবতীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রয়াস, নিজের সাথে সন্তান সন্ততি ও স্ত্রীদের সংশোধন চিন্তা ইত্যাদি বিষয় বস্তু শামিল আছে।

প্রথম গুণঃ "রহমানের প্রিয়বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা করে।" (সূরা ফুরকান: ৬৩)

অর্থাৎ গর্বভরে অহংকারীর ন্যায় না চলে বরং স্থিরতা গাম্ভীর্য বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে। উদ্দেশ্য এ নয় যে খুব ধীরে চলবে। কেননা বিনা প্রয়োজনে ধীরে চলা সুন্নত বিরোধী, শামায়েলের হাদীস থেকে জানা যায় যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুব ধীরে চলতেন না বরং কিছুটা দ্রুত গতিতে চলতেন। হযরত হাসান বসরী (রাঃ) উক্ত আয়াতের তফসীরে বলেন খাঁটি মুমিনের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চক্ষু কর্ন হাত পা আল্লাহর সামনে হীন ও অক্ষম হয়ে থাকে। অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে দেখে অপারগ ও পঙ্গু মনে করে অথচ তারা রুগ্নও নয় পঙ্গুও নয় বরং সুস্থ ও সবল। তবে তাদের উপর আল্লাহভীতি প্রবল যা অন্যদের উপর নেই। তাদেরকে পার্থিব কাজকর্ম থেকে পরকালের চিন্তা নিবৃত রাখে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে না এবং তার সমস্ত চিন্তা দুনিয়ার কাজেই ব্যাপৃত, সে সর্বদা দুঃখ ভোগ করে। কারণ, সে তো দুনিয়া পুরোপুরি পায় না এবং

পরকালের কাজেও অংশ গ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি পানাহারের বস্তুর মধ্যেই আল্লাহর নে'য়ামত সীমিত মনে করে এবং উত্তম চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে না তার জ্ঞান খুবই অল্প এবং তার জন্য শাস্তি তৈরী রয়েছে। (ইবনে কাসীর)

২য় গুণঃ "যখন অজ্ঞতা সম্পন্ন লোক তাদের সাথে কথা বলে তখন তারা বলে সালাম।" (সূরা ফুরকানের: ৬৩ নং আয়াতের শেষাংশ)

অর্থাৎ মুর্খদের জবাবে তারা নিরাপত্তার কথাবার্তা বলে নিজের জন্য কোন প্রতিশোধ নেয় না। যাতে অন্যরা কষ্ট না পায় এবং তারা নিজেরাও গুনাগার না হয়।

৩য় গুণঃ "তারা রাত্রি যাপন করে তাদের পালনকর্তার সামনে সেজদা করা অবস্থায় ও দন্ডায়মান অবস্থায়।" (ফুরকান: ৬৪)

এবাদতের জন্য রাত্রি জাগরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে এ সময়টি নিদ্রা ও আরামের। এতে নামাজ ও এবাদতের জন্য দন্ডায়মান হওয়া যেমন বিশেষ কষ্টকর, তেমনি এতে লোক দেখানো ও নাম যশের আশংকাও নেই। উদ্দেশ্য এই যে তারা দিবা রাত্রি আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকে। দিবাভাগে শিক্ষাদান প্রচার জিহাদ ইত্যাদি কাজ করে এবং রাত্রিকালে আল্লাহর সামনে এবাদত করে। হাদীসে তাহাজ্জুদ নামাজের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন; নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়। কেননা এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সব নেক বান্দার অভ্যাস ছিল। এটা তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য দানকারী, মন্দকাজের কাফ্ফারা এবং গুনা থেকে নিবৃতকারী। (তিরমিজী, মাযহারী)

হযরত ওসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন; যে ব্যক্তি এশার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে সে যেন অর্ধ রাত্রি এবাদতে অতিবাহিত করল এবং ফজরের নামাজ ও জামাতের সাথে আদায় করলে তাকে অবশিষ্ট অর্ধেক রাত্রিও এবাদতে অতিবাহিতকারী গণ্য করা হবে। (মুসলিম, আহমদ)

৪র্থ গুণঃ "তারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের হতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত করুন; এর শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ। আর জাহান্নাম আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে কত নিকৃষ্ট!" (সূরা ফুরকান ৬৫,৬৬)

সুতরাং আমাদের সবার উচিত এবাদতের সাথে সাথে আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করা।

৫ম গুণঃ "আল্লাহর প্রিয় বান্দারা ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে না এবং কৃপনতা ও ত্র"টি করে না বরং উভয়ের মধ্যবর্তী সমতা বজায় রাখে।" (সূরা ফুরকান: ৬৭) আরবী 'ইসরাফ' শব্দের অর্থ সীমা অতিক্রম করা, অপব্যয় করা অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে ব্যয় করা যদিও তা এক পয়সা হয় এবং বৈধ ও অনুমোদিত কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভূক্ত। কেননা 'তাবযীর' তথা অনর্থক ব্যয় কুরআনের অন্য আয়াত দ্বারা হারাম ও গুনাহ । আল্লাহ তা'আলা বলেন; "অনর্থক ব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই" (সূরা আল ইসরা: ২৭)।

সারমর্ম কথা হচ্ছে- গুনার কাজে যা-ই করা হয় তা অপব্যয় তথা হারাম। ইকতার অর্থ ব্যয়ে ত্রুটি ও কৃপণতা করা অর্থাৎ যে সব কাজে আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যয় করার আদেশ দিয়েছেন তাতে কম ব্যয় করা সুতরাং মোটেই ব্যয় না করা আরো মারাত্বক। অতএব আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের গুণ হচ্ছে তারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপব্যয় ও ত্র"টির মাঝখানে সততা ও মিতাচারের পথ অনুসরণ করে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন; ব্যয় করতে গিয়ে মধ্যবর্তীতা অবলম্বন করা মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক (আহমদ)।

অপর এক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন; যে ব্যক্তি ব্যয় কাজে মধ্যবর্তিতা ও সমতার উপর কায়েম থাকে সে কখনো দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থ হয় না। (আহমদ)

৬ষ্ট গুণঃ "আল্লাহর প্রিয় বান্দাগন এবাদতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না।" (সূরা ফুরকানের ৬৮ নং আয়াতের প্রথমাংশ) এতে জানা গেল যে শিরক সর্ববৃহৎ গুনাহ।

৭ম ও ৮ম গুনঃ এখান থেকে কার্যগত গুনাসমূহের মধ্যে কতিপয় প্রধান ও কঠোর গুনাহ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, যে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এসব গুনাহর কাছে যায় না। তারা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয় না। (সূরা ফুরকান: ৬৮)

বিশ্বাস ও কর্মের এই তিনটি বড় গুনাহ (শিরক, হত্যা, যিনা) বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন; যে ব্যক্তি উল্লেখিত গুনাহসমূহ করবে সে তার শাস্তি ভোগ করবে, শাস্তি খুব কঠিন হবে। কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎ কর্ম করবে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। যাহা পরবর্তী আয়াত দ্বারা বুঝা যায়।

৯ম গুণঃ তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অর্থহীন কাজ কর্মকে ভদ্রভাবে এড়িয়ে যায়। আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন:এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন অর্থহীন ও অনর্থক কাজ কর্মের সম্মুখীন হয় তখন সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করে ভদ্রভাবে চলে যায়। (সূরা ফুরকান: ৭২)

আল্লাহর নেক বান্দাগণ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, কারণ এতে অন্যের ন্যায়সঙ্গত অধিকার খর্ব হয়। অপর দিকে অন্যায়কে সাহায্য করা হয়। অন্যায় ও মিথ্যার চর্চা হয় এমন কোন স্থানে তারা কখনো উপস্থিত হয় না। শিরক হয় এমন কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে না। তারা গান-বাজনা ও নাচের অনুষ্ঠানে যায় না। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস উক্ত আয়াতে 'যূর' শব্দের অর্থ করেছেন, মুশরিকদের ধর্মীয় উৎসবাদী। (কুরতুবী খ: ১৩ পৃ: ৭৯) তাঁর এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে আল্লাহর নেক বান্দাগণ অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে যায় না। তাঁরা যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, অনৈতিক কোন কাজ করে না ও অশুভনীয় কোন আচার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয় না শুধু তাই নয়, যদি কখনো এসবের কাছ দিয়ে যেতে হয় তাহলে তারা খুবই সতর্কতার সাথে এসব এড়িয়ে চলে।

আয়াতের শেষাভাগের অর্থ- যখন তাঁরা অর্থহীন কোন কাজের পাশ দিয়ে যায়, তখন সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করে তা অতিক্রম করে। মুমিন কোন ধরনের অর্থহীন কথা বলতে পারে না, অর্থহীন কাজ করতে পারে না। এটি সফল মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মুমিন নিজকে কখনো অনর্থক ও গুরুত্বহীন কোন বিষয়ে জড়ায় না। মুমিন তো তার সময়ের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার করবে। সময় নামক মূল্যবান পূঁজির সর্বোত্তম বিনিয়োগ করবে। এমন কথা ও কাজে সময় খরচ করবে যা তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে দুনিয়া ও আখেরাতে। সে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে তার সময় কাজে লাগাবে।

রহমান এর বান্দাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো :

এবং যাদেরকে তাদের রব (পালন কর্তার) আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে বধির ও অন্ধের মত তাতে ঝুঁকে পড়ে না।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর 'ফাতহুলকাদীরে' বলা হয়েছে, আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর তাদের অবস্থান বধির ও অন্ধের মত নয় এবং তারা তাতে ঝুঁকে পড়ে এবং অবস্থায় যে তারা শোনে, দেখে এবং তা থেকে উপকৃত হয়। আয়াতসমূহের ব্যাপারে তারা মোটেই গাফেল নয়। (খ: ৪ পৃ: ৮৮)

মুমিনদের অবস্থা এমন হতে পারে না যে, তাদেরকে আল্লাহর আয়াত স্মরণ করানো হবে। আর তাদের মধ্যে তা কোন প্রভাব ফেলবে না। মুমিন যখন আল্লাহর মহান কিতাব কুরআন পড়বে তখন সে তা গভীর মনোযোগ সহকারে পড়বে। কুরআন বুঝবে, বুঝার চেষ্টা করবে, কুরআনের আয়াতসমূহ নিয়ে গবেষণা করবে। কুরআন পড়বে অথচ কুরআন বুঝার চেষ্টা করবে না, কুরআন নিয়ে গবেষণা করবে না, এতো মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। এটি তো এমন লোকদের বৈশিষ্ট্য যাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন; এদের প্রতিই আল্লাহ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদের বধির ও দৃষ্টি শক্তিহীন করেছেন। তারা কি কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা করে না। না তাদের অন্তরসমূহ তালাবদ্ধ? (সূরা মুহাম্মদ ২৩-২৪)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, কুরআন নিয়ে গবেষণা না করা আল্লাহর অভিসম্পাতপ্রাপ্ত অন্ধ-বধিরদের বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহর মহান কিতাব কুরআনের আয়াত একদিকে আল্লাহর নেক বান্দাহদের ঈমান বাড়িয়ে দেয়। অপরদিকে যাদের অন্তরে রয়েছে অবিশ্বাস ও কপটতা তাদের মনের অপবিত্রতা বৃদ্ধি করে। এ প্রসঙ্গে

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন; তারাই তো মুমিন যাদেরকে আল্লাহর স্মরণ কেরিয়ে দেয়া হলে তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে। আর তারা তাদের প্রভুর উপর ভরসা করে। (২ : আনফাল)

যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এটি তাদের (অন্তরের) কলুষতার সাথে আরো কলুষতা বৃদ্ধি করছে। (১২৫ : তাওবা)

সূরা ফোরকানের শেষাংশে উল্লিখিত রাহমান করুণাময় আল্লাহর বান্দাদের বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য দোয়া করে। এবং যারা বলছে হে আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে আমাদের চোখের শীতলতা স্বরূপ বানিয়ে দাও এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের ঈমাম বানিয়ে দাও। (সূরা ফুরকান: ৭৪)

আল্লাহর বান্দগণ নিজেরাই শুধু উত্তম বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর অধিকারী হবে তা নয়, তারা চায় তাদের সন্তানরাও যেন এ ধরনের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী অর্জন করে। তারা চায় তাদের স্ত্রীগণ যেন তাদের মত উত্তম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয় তাহলে মন আনন্দে ভরে যাবে। আর এ আনন্দে শুধু মানসিক প্রশান্তি ও তৃপ্তি পাওয়া যাবে না, বরং আনন্দে চোখ জুড়িয়ে যাবে।

আল্লাহর নেক বান্দাগণের আকাঙ্খা তাদের সন্তান ও স্ত্রীগণ যেন আল্লাহকে যারা ভয় করে চলে তাদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হয়। তারা তাদের আকাঙ্খা পূরণের জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানায়। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে আল্লাহ যেন তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের এমন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর অধিকারী বানিয়ে দেয় যাতে তাদের চোখ জুড়িয়ে যায়। আল্লাহ যেন তাদেরকে মুত্তাকীদের ঈমাম (নেতা) বানিয়ে দেয়।

স্ত্রী সন্তানদের উত্তম গুণাবলীর অধিকারী করে চোখের শীতলতারূপে বানানো ও তাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ বানানোর জন্য দোয়া করাকেও আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাদের একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ স্ত্রী সন্তানরা হচ্ছে একজন লোকের সবচেয়ে কাছের মানুষ। এদের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশী জবাবদিহী করতে হবে। স্ত্রী ও সন্তান যদি আল্লাহর অনুগত হয়ে চলে তাহলে একজন মুমিনের জন্য এর চেয়ে বড় প্রশান্তি আর কিছু নেই। আর যদি তারা আল্লাহর অবাধ্য হয় তাহলে এর চেয়ে বড় বেদনার কিছু নেই।

আয়াতে চোখের শীতলতা বলতে রূপ, সৌন্দর্য, পার্থিব মেধা, যোগ্যতা ও সফলতাকে বুঝানো হয়নি। বরং এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে আল্লাহর আনুগত্য ও বাধ্যতা। আল্লামা ইবনে কাসীর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ যারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যে, তিনি যেন তাদের ঔরশ থেকে এমন সন্তান সৃষ্টি করেন, যে

তাঁর আনুগত্য করবে ও শুধু মাত্র তারই ইবাদত করবে। তার কোন শরীক নেই। (তাফসীর ইবনে কাসীর খঃ ৩ পৃঃ ৩২৯)

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত হাসান বসরীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ, সন্তান, সন্তানের সন্তান, ভাই অথবা বন্ধুকে আল্লাহর অনুগত দেখবে মুসলমানের চোখকে ঠাণ্ডা ও শীতল করার জন্য এর চেয়ে উত্তম কোন বিষয় নেই। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ৩ পৃ: ৩২৯)

উপরের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হলো যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে হলে শুধু নিজে ভাল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেই চলবে না, স্ত্রী ও সন্তানদেরকে ভালগুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বানানোর জন্য চেষ্টা করতে হবে।

রাহমান করুণাময়ের বান্দাহদের বৈশিষ্ট্য আলোচনার পর তাদের পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে এভাবে তাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে (জান্নাতের) কক্ষ তাদের ধৈর্যের প্রতিদানে। তাদেরকে সেখানে অভিবাদন ও সালাম দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হবে। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। বসবাস ও আবাসস্থল হিসেবে তা কতই না উত্তম। বলা হয়েছে তাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে (জান্নাতের) কক্ষ। যাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে তারা কারা? তারা রাহমান পরম করুণাময় আল্লাহর বান্দা। যারা পূর্বের আয়াতসমূহে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ও গুণবলীর অধিকারী।

তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে, 'তারা যে ধৈর্যধারণ করেছিল তার প্রতিদানে। এর থেকে বুঝা গেল রাহমান এর বান্দাহদের যেসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে এসব গুণাবলী অর্জন সম্ভব নয়, নফস প্রবৃত্তির লাগামহীন কামনা বাসনাকে দমন করে কঠোর সাধনার মাধ্যমে এ গুণাবলী অর্জন করতে হবে। দৃঢ় সিদ্ধান্ত ও প্রবৃত্তির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকলেই এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করা সম্ভব। আল্লাহর নেক বান্দাহদের জান্নাতে সালাম ও শুভেচ্ছার মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হবে। তাদেরকে এ অভ্যর্থনা জানাবে জান্নাতের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন :

যারা তাদের রব (প্রভুকে) ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের কাছে পৌঁছবে আর জান্নাতের দরজাগুলো আগ থেকেই খোলা থাকবে তখন জান্নাতের রক্ষীগণ বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, তোমরা স্থায়ীভাবে থাকার জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর। (৭৩ :

যুমার) রাহমান এর বান্দাহদের স্থায়ী আবাস হবে জান্নাত। জান্নাতের পরিচয়ে বলা হয়েছে ; বসবাস ও আবাসস্থল হিসেবে তা কতই না উত্তম। ঠিক এর বিপরীত কথা বলা হয়েছে জাহান্নাম সম্পর্কে। যে জাহান্নাম থেকে রাহমান এর বান্দারা বাঁচতে চায়। বসবাস ও আবাসস্থল হিসেবে এটি কতই না নিকৃষ্ট। নিকৃষ্ট আবাস জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য রাহমান এর বান্দাগণ তাঁর দরবারে আকুতি জানায়, শুধু আকুতিই নয় এর থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্জন করে। আর এভাবেই তারা উত্তম আবাস জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের সর্বোত্তম পুরস্কার ও প্রতিদান ঘোষণার পর বলেন,বল! আমার প্রভু তোমাদেরকে পরোয়া করে না যদি তোমরা তাকে না ডাক। তোমরা মিথ্যা বলছ। অতএব শীঘ্র তোমরা সম্মুখীন হবে অনিবার্য শাস্তির।

এ আয়াতের তাফসীরে ইবন কাসীর রহ. বলেন: যদি তোমরা (আল্লাহর) ইবাদত না কর তাহলে তিনি তোমাদের কোন পরোয়া করেন না। কেননা তিনি তাঁর ইবাদত ও তাঁর একাত্মতা স্বীকারের জন্য এবং সকাল সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা বর্ণনার জন্য বিশেষ সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন।

হে কাফেররা (তোমরা মিথ্যা বলছ) আর তোমাদের এ মিথ্যাই তোমাদেরকে আখিরাতে শাস্তি এবং দুনিয়ায় ধ্বংস ও বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেবে। (তাফসীরে ইবন কাসীর খঃ ৩ পৃঃ ৩৩০)

এ আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে আল্লাহ যে বান্দাহদেরকে তার একক প্রভুত্ব ও নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে বাস্তব জীবনে তাঁর দাসত্ব মানার জন্য আদেশ করেন। এটি এ জন্য নয় যে, তিনি এর প্রয়োজন বোধ করেন। বরং আল্লাহ তার গোটা সৃষ্টির আনুগত্য ও দাসত্ব থেকে মুখাপেক্ষীহীন। আল্লাহকে মানা ও তাঁর দাসত্ব ও গোলামী করা মানুষেরই দায়িত্ব, এতে তাদেরই কল্যাণ দুনিয়াতে ও আখিরাতে।

সূরায়ে ফোরকানের শেষাংশে রাহমান এর বান্দাদের যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হয়েছে সংক্ষেপে সেগুলো হলো :

১. বিনয় ২. ধৈর্য্য ও সহনশীলতা ৩. তাহাজ্জুদ আদায় ৪. জাহান্নামের ভয় ও তা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা ৫. অপব্যয় ও কৃপণতা না করা ৬. শিরকমুক্ত থাকা ৭. যেনা ব্যভিচার ও হত্যার সাথে জড়িত না হওয়া ৮. তাওবা করা ৯. মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা ও অর্থহীন কাজকে এড়িয়ে চলা, ১০. কুরআনের আয়াত অনুধাবন করা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। ১১. স্ত্রী ও সন্তান যেন আল্লাহর অনুগত হয় এ জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করা।

আল্লাহ এসব গুণাবলী অর্জন করে আমাদেরকে জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার তাওফিক দিন।

সংগৃহীত- আল্লাহ লেখক কে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭৪৩

১০০টি কবীরা গুনাহ:

power

Senior Member

০৭-২৫-২০১৫

بسم الله الرحمن الرحيم

কবীরা গুনাহ কাকে বলে?

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রহ. বলেন, কবীরা গুনাহ হল: যে সব গুনাহের কারণে দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক শাস্তির বিধান আছে এবং আখিরাতে শাস্তির ধমক দেয়া হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, যে সব গুনাহের কারণে কুরআন ও হাদীসে ঈমান চলে যাওয়ার হুমকি বা অভিশাপ ইত্যাদি এসেছে তাকেও কবীরা গুনাহ বলে। কবীরা গুনাহ বলা হয় ঐ সকল বড় বড় পাপকর্ম সমূহকে যেগুলোতে নিম্নোক্ত কোন একটি বিষয় পাওয়া যাবে:

- যে সকল গুনাহের ব্যাপারে ইসলামে শরীয়তে জাহান্নামের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।
- যে সকল গুনাহের ব্যাপারে দুনিয়াতে নির্ধারিত দণ্ড প্রয়োগের কথা রয়েছে।
- যে সকল কাজে আল্লাহ তায়ালা রাগ করেন।
- যে সকল কাজে আল্লাহ তায়ালা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ফেরেশতা মণ্ডলী লানত দেন।
- যে কাজের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যে এমনটি করবে সে মুসলমানদের দলভুক্ত নয়।
- কিংবা যে কাজের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

• যে কাজে দ্বীন নাই, ঈমান নাই ইত্যাদি বলা হয়েছে।

• যে ব্যাপারে বলা হয়েছে এটি মুনাফিকের আলামত বা মুনাফিকের কাজ।
• অথবা যে কাজকে আল্লাহ তায়ালা সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় করা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকার মর্যাদাঃ

১. মহান আল্লাহ বলেন:

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا
''যে সকল বড় গুনাহ সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা সে সব বড় গুনাহ থেকে বেচে থাকতে পার, তবে আমি তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দিব এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাব।'' (nisa: ৩১)

২. রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

الصلوات الخمس . والجمعة إلى الجمعة . ورمضان إلى رمضان . مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر

"পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমআ থেকে আরেক জুমআ এবং এক রামাযান থেকে আরেক রামাযান এগুলো উভয়ের মাঝে সংঘটিত সমস্ত পাপরাশীর জন্য কাফফারা স্বরূপ যায় যদি কবীরা গুনাহ সমূহ থেকে বেঁচে থাকা যায়।" (মুসলিম)

১০০টি কবীরা গুনাহ:

১. আল্লাহর সাথে শিরক করা।

২. নামায পরিত্যাগ কর।

৩. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।

৪. অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা।

৫. পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করা।

৬. যাদু-টোনা করা।

৭. এতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা।

৮. জিহাদের ময়দান থেকে থেকে পলায়ন করা।

৯. সতী-সাধ্বী মু'মিন নারীর প্রতি অপবাদ দেয়া।

১০. রোযা না রাখা।

১১. যাকাত আদায় না করা।

১২. ক্ষমতা থাকা সত্যেও হজ্জ আদায় না করা।

১৩. যাদুর বৈধতায় বিশ্বাস করা।

১৪. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া।

১৫. অহংকার করা।

১৬. চুগলখোরি করা (ঝগড়া লাগানোর উদ্দেশ্যে একজনের কথা আরেকজনের নিকট লাগোনো)।

১৭. আত্মহত্যা করা।

১৮. আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করা।

১৯. অবৈধ পথে উপার্জিত অর্থ ভক্ষণ করা।

২০. উপকার করে খোটা দান করা।

২১. মদ বা নেশা দ্রব্য গ্রহণ করা।

২২. মদ প্রস্তুত ও প্রচারে অংশ গ্রহণ করা।

২৩. জুয়া খেলা।

২৪. তকদীর অস্বীকার করা।

২৫. অদৃশ্যের খবর জানার দাবী করা।

২৬. গণকের কাছে ধর্না দেয়া বা গণকের কাছে অদৃশ্যের খবর জানতে চাওয়া।

২৭. পেশাব থেকে পবিত্র না থাকা।

২৮. রাসূল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করা।

২৯. মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা।

৩০. মিথ্যা কথা বলা।

৩১. মিথ্যা কসম খাওয়া।

৩২. মিথ্যা কসমের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করা।

৩৩. জিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।

৩৪. সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া।

৩৫. মানুষের গোপন কথা চুপিসারে শোনার চেষ্টা করা।

৩৬. হিল্লা তথা চুক্তি ভিত্তিক বিয়ে করা।

৩৭. যার জন্যে হিলা করা হয়।

৩৮. মানুষের বংশ মর্যাদায় আঘাত হানা।

৩৯. মৃতের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করা।

৪০. মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা।

৪১. মুসলিমকে গালি দেয়া অথবা তার সাথে লড়ায়ে লিপ্ত হওয়া।

৪২. খেলার ছলে কোন প্রাণীকে নিক্ষেপ যোগ্য অস্ত্রের লক্ষ্য বস্তু বানানো।

৪৩. কোন অপরাধীকে আশ্রয় দান করা।

৪৪. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু জবেহ করা।

৪৫. ওজনে কম দেয়া।

৪৬. ঝগড়া-বিবাদে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা।

৪৭. ইসলামী আইনানুসারে বিচার বা শাসনকার্য পরিচালনা না করা।

৪৮. জমিনের সীমানা পরিবর্তন করা বা পরের জমি জবর দখল করা।

৪৯. গীবত তথা অসাক্ষাতে কারো দোষ চর্চা করা।

৫০. দাঁত চিকন করা।

৫১. সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে মুখ মণ্ডলের চুল তুলে ফেলা বা চুল উঠিয়ে ভ্রু চিকন করা।

৫২. অতিরিক্ত চুল সংযোগ করা।

৫৩. পুরুষের নারী বেশ ধারণ করা।

৫৪. নারীর পুরুষ বেশ ধারণ করা।

৫৫. বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কামনার দৃষ্টিতে তাকানো।

৫৬. কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করা।

৫৭. পথিককে নিজের কাছে অতিরিক্ত পানি থাকার পরেও না দেয়া।

৫৮. পুরুষের টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পোশাক পরিধান করা।

৫৯. মুসলিম শাসকের সাথে কৃত বাইআত বা আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করা।

৬০. ডাকাতি করা।

৬১. চুরি করা।

৬২. সুদ লেন-দেন করা, সুদ লেখা বা তাতে সাক্ষী থাকা।

৬৩. ঘুষ লেন-দেন করা।

৬৪. গনিমত তথা জিহাদের মাধ্যমে কাফেরদের নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পদ বণ্টনের পূর্বে আত্মসাৎ করা।

৬৫. স্ত্রীর পায়ু পথে যৌন ক্রিয়া করা।

৬৬. জুলুম-অত্যাচার করা।

৬৭. অস্ত্র দ্বারা ভয় দেখানো বা তা দ্বারা কাউকে ইঙ্গিত করা।

৬৮. প্রতারণা বা ঠগ বাজী করা।

৬৯. রিয়া বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎ আমল করা।

৭০. স্বর্ণ বা রৌপ্যের তৈরি পাত্র ব্যবহার করা।

৭১. পুরুষের রেশমি পোশাক এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য পরিধান করা।

৭২. সাহাবীদের গালি দেয়া।

৭৩. নামাযরত অবস্থায় মুসল্লির সামনে দিয়ে গমন করা।

৭৪. মনিবের নিকট থেকে কৃতদাসের পলায়ন।

৭৫. ভ্রান্ত মতবাদ জাহেলী রীতিনীতি অথবা বিদআতের প্রতি আহবান করা।

৭৬. পবিত্র মক্কা ও মদীনায় কোন অপকর্ম বা দুষ্কৃতি করা।

৭৭. কোন দুষ্কৃতিকারীকে প্রশ্রয় দেয়া।

৭৮. আল্লাহর ব্যাপারে অনধিকার চর্চা করা।

৭৯. বিনা প্রয়োজনে তালাক চাওয়া।

৮০. যে নারীর প্রতি তার স্বামী অসন্তুষ্ট।

৮১. স্বামীর অবাধ্য হওয়া।

৮২. স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর অবদান অস্বীকার করা।

৮৩. স্বামী-স্ত্রীর মিলনের কথা জনসম্মুখে প্রকাশ করা।

৮৪. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাদ সৃষ্টি করা।

৮৫. বেশী বেশী অভিশাপ দেয়া।

৮৬. বিশ্বাস ঘাতকতা করা।

৮৭. অঙ্গীকার পূরণ না করা।

৮৮. আমানতের খিয়ানত করা।

৮৯. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া।

৯০. ঋণ পরিশোধ না করা।

৯১. বদ মেজাজি ও এমন অহংকারী যে উপদেশ গ্রহণ করে না।

৯২. তাবিজ-কবজ, রিং, সুতা ইত্যাদি ঝুলানো।

৯৩. পরীক্ষায় নকল করা।

৯৪. ভেজাল পণ্য বিক্রয় করা।

৯৫. ইচ্ছাকৃত ভাবে জেনে শুনে অন্যায় বিচার করা।

৯৬. আল্লাহ বিধান ব্যতিরেকে বিচার-ফয়সালা করা।

৯৭. দুনিয়া কামানোর উদ্দেশ্যে দীনী ইলম অর্জন করা।

৯৮. কোন ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে জানা সত্যেও তা গোপন করা।

৯৯. নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে দাবী করা।

১০০. আল্লাহর রাস্তায় বাধা দেয়া।

আল্লাহ বলেন:

‘‘যে সকল বড় গুনাহ সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা সে সব বড় গুনাহ থেকে বেচে থাকতে পার, তবে আমি তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দিব এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাব।’’ (nisa: ৩১)

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা যারা কবীরা গুনাহ থেকে বেচে থাকবে তাদেরকে দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করানোর দায়িত্ব নিয়েছেন, কারণ ছগীরা গুনাহ বিভিন্ন নেক আ‘মাল যেমন- স্বলাত, সওম, জুমআ, রমযান ইত্যাদির মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বেশি বেশি নেক আমাল করার তাওফীক দান করুন ও যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখুন এবং আমাদের অন্তরকে আলোকিত করে দিন। আমীন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩৫৪

গণতন্ত্র দিয়ে কি মনজিলে মকসুদে পৌঁছা যাবে

tayfamansura

Member

১২-০৯-২০১৫

গণতন্ত্র দিয়ে কি মনজিলে মকসুদে পৌঁছা যাবে??

গত পর্বে আমরা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছি যে বর্তমান পার্লামেন্টারী সিস্টেমে অনুপ্রবেশ করা কোন মুসলিমের জন্যে জায়েয নয়। আজকে আমরা একটা ভিন্ন আঙ্গিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে বুঝার চেষ্টা করবো। যুক্তির খাতিরে যদি ধরে নিই যে শরীআ পরিস্থিতির কারনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে মৃদু সম্মতি দেয়, তাহলেই কি আমরা সেই মনজিলে মকসুদে পৌছঁতে পারবো যা আমরা চাই??

আসলে দুনিয়ার অনেক বিষয়ই আছে যেটা অনেকটা গণিতের মত, গাণিতিক সমীকরন দিয়েই বুঝে ফেলা যায়, এর জন্য বছরের পর বছর টেস্ট প্রজেক্ট খেলে খেলে মিশর আর আলজেরিয়া হতে হয় না। x^২ = -১ এই সমীকরণের যেমন কোন বাস্তব সমাধান নেই, কাল্পনিক একটা বিষয়, ঠিক তেমনি গণতন্ত্র দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চিন্তভাবনাও কোন বাস্তবসম্মত চিন্তাভাবনা নয়, নিছক দিবাস্বপ্ন মাত্র। এখানে x এর লক্ষ-কোটি মান একের পর এক বসিয়ে পরীক্ষা করার দরকার নেই, সমীকরণই বলে দিচ্ছে যে এর কোন বাস্তব সমাধান নেই। ১ এর উপরে সূচক (Power) হিসেবে (অর্থাৎ ১^x) যা-ই বসাও না কেন ফলাফল কখনই ১০০ হবে না। চাই ১ এর উপর সূচক (Power) ১oo বসাও, ১ লাখ বসাও কিংবা ১ কোটি বসাও, ফলাফল শুধু এবং শুধুমাত্র ১ ই হবে, এর বেশি কিছুতেই হবে না। গাণিতিক যুক্তিগুলো যদি কারও বুঝতে অসুবিধা হয়, তার জন্যে সহজ করে বলি- গণতন্ত্র দিয়ে ইসলাম কায়েমের স্বপ্ন, মইয়ের উপর মই বসিয়ে চাঁদে পাড়ি দেওয়ার স্বপ্নের চেয়েও অবাস্তব। পাকিস্তানের অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ Dr. Israr Ahmed যিনি একসময় জামাআতে ইসলামী করতেন, এক আলোচনায় ‘গণতন্ত্র দিয়ে কখনই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাবে না’- এর কারন হিসেবে বলেছিলেন-

"DEMOCRATIC ELECTIONS ARE HELD TO RUN THIS SYSTEM, NOT TO CHANGE THIS SYSTEM."

যেসব কারনে গণতন্ত্র দিয়ে কখনই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাবে না-

১.

কুফর-শির্ককে মিটিয়ে দিয়ে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার পর ইসলামী রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল- নামায কায়েম করা। এবং এ কাজ না করলে হাদীসে শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার অনুমতিও আছে। মহান আল্লাহ বলেন-

"আমি তাদেরকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকর্মের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে, আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে"। [সূরা হাজ্জ : ৪১]

সহীহ মুসলিমে আউফ বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নেতা তারাই যাদেরকে তোমরা ভালোবাসো আর তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে এবং তারা তোমাদের জন্য দুআ করে এবং তোমরাও তাদের জন্য দুআ কর। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নেতা তারা যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদের অভিসম্পাত করো এবং তারাও তোমাদের অভিসম্পাত করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তলোয়ার দিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করবো না?? আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মাঝে সালাত কায়েম রাখে ততক্ষণ পর্যন্ত নয়"।

নামায কায়েমের ব্যাপারে রাষ্ট্রের কর্তব্য কি? এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফার (রহঃ)মত হল বে-নামাযীকে তওবা না করা পর্যন্ত জেলে বন্দী রাখা হবে আর অন্যান্য আলেমদের মত হল তাদেরকে তওবার আহ্বান জানানো হবে অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। [সূত্রঃ তাফসীরে সূরা তাওবা/ ড. আব্দুল্লাহ ইউসুফ আযযাম রহঃ, সালাত পরিত্যগকারীর বিধান/ ইবনে উসাইমীন রহঃ]

এখন, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার সবচেয়ে Vital একটি Element এ গণতন্ত্র কতটুকু সফল হবে??

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এক জরিপে দেখা গেছে দেশের মাত্র ২% মানুষ নিয়মিতভাবে ৫ ওয়াক্ত নামায পড়ে। তাহলে আপনি কি করে আশা করেন যে তারা নামায কায়েমের এ ধরনের বিধানের পক্ষে ভোট দিবে?? অর্থাৎ তাদের ভোটে ইসলামী বিধান বাস্তবায়িত হবে এটা একটা আকাশ কুসুম কল্পনা।

ইনফ্যাক্ট গণতন্ত্রবাদী কোন একটি ইসলামি দল যদি ভাগ্যক্রমে ক্ষমতায় আসেও, তবুও তারা কখনই নামায কায়েম করবে না। কেননা এতে পরের নির্বাচনে তাদের ভরা ডুবির আশংকা আছে!!

[এ বিষয়টা আরো একটু পরিষ্কার করিঃ যদি কোন রাষ্ট্রের শতভাগ মুসলিম নামায পড়ে তবুও আমরা ঐ রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলবো না, যদি না সেখানে রষ্ট্রীয়ভাবে বেনামাযীর শাস্তির বিধান না থাকে। কিন্তু যে রাষ্ট্রে বেনামাযীর শাস্তির বিধান আছে, চাই সে রাষ্ট্রের সবাই নামায নাও পড়ুক তবুও সেটা ইসলামিক রাষ্ট্র। বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্ক সম্যক আইডিয়া না থাকার কারনেই এই বিভ্রান্তগুলো ছড়াচ্ছে। কেউ কেউ তো এমনটিও মনে করে যে তাদের দল পার্লামেন্টের ১৫১ টা সিট পেলেই বুঝি রাষ্ট্র ইসলামী হয়ে যাবে!!]

২.

ইসলাম নামক মুক্তির বিহঙ্গ আজ জাতীয়তাবাদ নামক লোহার খাঁচায় বন্দী। মুসলিমদের সীসা-ঢালা ভাতৃত্বের বন্ধন আজ বৃটেন, ফ্রান্সের এঁকে দেওয়া সীমারেখায় কেঁদে কেঁদে মরছে। গণতন্ত্র কি পারবে এ লোহার খাঁচা ভেঙে উম্মাহকে পুনরায় ঐক্য আর মুক্তির স্বাদ দিতে ??

৩.

কোন ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম থেকে ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান হয়ে গেলে কিংবা নাস্তিক হয়ে গেলে ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল তাকে তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসার আহ্বান জানানো। এতে যদি সে অপরাগ হয় তাহলে রাষ্ট্রের কর্তব্য হল তাকে ক্বতল করা।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

“যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে পরিত্যাগ করে (বা বদলে ফেলে), তাকে ক্বতল কর”। [সহীহ বুখারী-২৭৯৪]

ইমাম তিরমিযী তাঁর জামে তিরমিযীর ১৪৫৮ নম্বর হাদীস- **من بدل دينه فاقتلوه** অর্থাৎ যে তার দ্বীন পরিবর্তন করবে, তাকে হত্যা করে ফেলবে-এর অধীনে লিখেছেন-

والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد

অর্থাৎ মুরতাদের শাস্তির বিষয়ে ইলমের সকল ধারক-বাহকের নিকট এটাই অনুসৃত বিধান।

আপনার কি মনে হয় যারা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ পরিচালনা করছে, কোটি কোটি ডলার খরচ করছে মানুষকে ধর্মান্তরিত করার জন্য, তারা এত সহজে আপনাকে এই আইন বাস্তবায়ন করতে দিবে??

৪. ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল তা ইয়াহুদী খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করবে। ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহঃ, "আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়" (সূরা আনফাল : ৩৯) এই আয়াতের উল্লেখ করে বলেন –
"আল জিহাদের লক্ষ্য তো এটাই যে আল্লাহর কালিমা সুউচ্চ হবে এবং দ্বীন সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে"।

তিনি আরো বলেন-

"দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ হল- কাফিররা নত হবে এবং তাদের নেতাদের উপর জিযিয়া কার্যকর হবে এবং তাদের উপর দাসত্ব চাপানো হবে- এটাই আল্লাহর দ্বীনের দাবী। এর একেবারে বিপরীত হল কাফিরদেরকে তাদের ক্ষমতা বজায় রেখে যেভাবে খুশী তাদের দ্বীন প্রচারের সুবিধা করে দেওয়া যাতে তারা ক্ষমতাশীল ও দৃঢ়পদ হয়"। [আহকামুল যিম্মাহ]

যারা কারনে অকারনে মার্কিন দূতাবাসে ধন্যা দেয়, তারা এটা করার সাহস দেখাবে বলে কি আপনার মনে হয়?? কুফফারদের ফর্মুলা Follow করে তাদের স্বার্থবিরোধী আইনের স্বপ্ন দেখা কি নিছক বিভ্রান্তি নয়??

৫. ইসলামী রাষ্ট্র ইসলাম বিরোধী সকল প্রকার বাতিল মতবাদ, মানব রচিত তন্ত্র-মন্ত্র ও দলকে নিষিদ্ধ করবে- চাই তারা বামপন্থী হোক, সেক্যুলারপন্থী হোক, কিংবা জাতীয়তাবাদী হোক। তাদেরকে তওবা করার আহ্বান জানানো হবে, অন্যথায় তাদেরকে মুরতাদ ঘোষণা করে হত্যা করা হবে।

শুধু তাই নয়, ইসলামে 'সরকারী দল' এবং 'বিরোধী দল' এ জাতীয় পরিভাষাগুলো সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য, সকল প্রকার দলাদলি নিষিদ্ধ, এক আমীরের নেতৃত্বে গোটা উম্মাহ- এটাই হল ইসলামিক মডেল। বহুদলীয় গণতন্ত্রকে স্বীকার করে নিয়ে এ কাজ করার সুযোগ কোথায়??

জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় এসে তাদের প্রিয় নাস্তিক-বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিককে হত্যা করার নৈতিক শক্তি একটি ইসলামি দল কই পাবে? রাজনৈতিক দলসমূহকে নিষিদ্ধ করতে গেলে কার্যত গণতন্ত্রকেই কবর চাপা দিতে হবে। যে জনগণের কাছ থেকে ভোটভিক্ষার মাধ্যমে দলটি ক্ষমতায় এসেছে তারা এটা মানবে কেন?? ঐ সমস্ত দলগুলো বা তাদের সাপোর্টাররাইবা বসে থাকবে কেন?? আর পশ্চিমারাইবা বসে বসে আঙুল চুষবে কেন??

৬. একটি ইসলামী রাষ্ট্র সকল প্রকার অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, যত্রতত্র বেপর্দা চলাফেরা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, সহশিক্ষা, অশ্লীল নাটক, সিনেমা, যাত্রাপালা নিষিদ্ধ করবে। সিনেমা হল, নাইটক্লাব, মদের বার, ডিজে পার্টি, নিষিদ্ধ গানের আসর বন্ধ করবে। সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে ফেলবে। ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী পত্র-পত্রিকা, ম্যগাজিন, ব্লগ, সাময়িকী, বইপত্র, কবিতা, উপন্যাস, সাহিত্য নিষিদ্ধ করবে। বিবাহিত ব্যভিচারীকে রজম করে হত্যা করবে, সমকামীদের হত্যা করবে। চারুকলা-কারুকলার নামে নিষিদ্ধ মূর্তি-ভাস্কর্য তৈরির চর্চা বন্ধ করবে। গণতান্ত্রিক পন্থায় এসব করার সুযোগ কোথায়??

আপনি যদি ক্ষমতায় যেতে চান তাহলে আপনাকে জনপ্রিয়তা খুঁজতে হবে। আর আপনি যদি জনপ্রিয়তা খুঁজতে চান তাহলে রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা আপনার নিজের মাঝেই ইসলাম থাকবে না। আসলে জনপ্রিয়তার রাজনীতিই আজকের ইসলামী দলসমূহের আদর্শিক অধঃপতনের প্রধান কারন।

আল কুরআনে আল্লাহ বলেন-

“আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অনুসরণ করেন তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে পথভ্রষ্ট করে দেবে; তারা শুধু নিছক ধারণা ও অনুমানের অনুসরণ করে, আর তারা ধারণা ও অনুমান ছাড়া কিছুই করছে না”। [আল-আনআম : ১১৬]

আরো একটা লক্ষণীয় বিষয় হল, মহান আল্লাহ বলেন-

“যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এবং তুমি মানুষকে দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে দেখবে ..... “ [সূরা নাসর]

কাজেই ইসলামের বিজয় আসলেই মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে। কিন্তু গনতন্ত্রী ভাইয়েরা উল্টো বুঝে মনে করেন, আগে মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে, তারপরে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সূত্রে তারা ইসলামের বিজয় ঘটাবেন!!

৭. সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থাকে উৎখাত করতে গেলে এবং যাকাত ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক করতে গেলে দেশের ভোগবাদী ধনিক শ্রেণী আপনাকে অপসারন করার সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালাবে। কেননা এই সুদের জোরেই তারা জিইয়ে রেখেছে তাদের আদিগন্ত ভোগলিপ্সা, শাসন, শোষণ, অবৈধ কর্তৃত্ব আর সম্পদের বিশাল পাহাড়। আর একথা তো সর্বজনবিদিত যে বর্তমান পুঁজিবাদ নির্ভর গনতন্ত্রের পেছনের কলকাঠি নাড়ে এই ব্যবসায়ী গ্রুপ। আবূ বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর যুগেও একটা গ্রুপ যাকাত না দেওয়ার জন্য অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছিল । তাহলে তো বর্তমান যুগের পুঁজিবাদীদের কথা বলাই বাহুল্য।

৮. মিশর কিংবা আলজেরিয়ার মত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য দরকার পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণ। গণতন্ত্রবাদীদের এসব পরিস্থিত ট্যাকল দেওয়ার প্রস্তুতি কতটুকু?? তাদের প্রস্তুতি তো কেবল পোস্টারিং আর দেওয়াল লিখন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। বরং তারা এ ধরনের প্রস্তুতিকে অসাংবিধানিক ও অনিয়মতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে থাকে। অথচ আলেমদের পরিষ্কার মত হচ্ছে সার্বক্ষনিক জিহাদের প্রস্তুতি মুসলিমদের জন্য ফরয, চাই যুদ্ধের পরিস্থিতি থাকুক, আর নাই থাকুক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

“তোমরা কাফিরদের মোকাবেলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদা সজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে”। [সূরা আনফাল ৬০]

“কাফেররা কামনা করে যেন তোমরা অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাব সম্পর্কে অসতর্ক হও যাতে তারা তোমাদের একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে”। [সূরা নিসা ১০২]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন –

“তোমরা অনেক রাষ্ট্র জয় করবে এবং তোমরা নিরাপদ নিশ্চিন্তে থাকবে। যদি তা হয় তবুও তোমরা তীরন্দাজী ছেড়ে দিও না”। [সহীহ মুসলিম, উকবাহ (রাঃ) এর বর্ণনায়]

আসলে গণতন্ত্র হল কুফফারদের তৈরি করা ফাঁদ। যখন তারা দেখবে একটি ইসলামী দল ক্ষমতায় চলে এসেছে তখন তারা মিথ্যা অভিযোগে তাদের উপর সন্ত্রাসী হামলা চালাবে এবং তখনও তারা গণতন্ত্র রক্ষারই অজুহাত দিবে!! ১১১২২৩৩৯_১৪৪২৮০৬৫৬২৬৯৮৬৭১_১০০১৭৪৫২৫৩_n

দেখুন ইতিহাস কি বলে-

ক) তুরস্কঃ

আরবী ভাষায় আযান পুনরায় চালু করার জন্যে ১৯৬০ সালে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট আদনান মেন্দারেসের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো হয় এরপর তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। ১৯৮০ সালে তুরস্কের সেক্যুলার সেনাবাহিনী, মধ্যমপন্থী-ইসলামপন্থী কোয়ালিশনের সরকারকে আবার ক্ষমতাচ্যুত করে। ইসলামী দল নিষিদ্ধ করে। ১৯৯৭ সালে তুরস্কের ইসলামপন্থী প্রধানমন্ত্রী নাজিম€Œ উদ্দীন আরবাকান কট্টর ইসলাম বিদ্বেষী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সেনাবাহিনীর চাপের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

খ) তিউনিসিয়াঃ

১৯৮৯ সালে তিউনিসিয়ার সেনাবাহিনী ও পশ্চিমা সমর্থিত শাসক যখন দেখতে পেল রশীদ ঘানুশীর নেতৃত্বাধীন ‘আন নাহদা’ নির্বাচনে অংশগ্রহনে বাধা স্বত্তেও স্বতন্ত্রভাবেই বিপুল ভোট পাচ্ছে, তখন ২৫ হাজার ইসলামপন্থীকে বিশৃংখলা ও

রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে জেলে ঢুকিয়ে দেয় আর সেই সাথে কয়েকজন নেতাকে ফাঁসিতেও লটকে দেয়।

গ) আলজেরিয়াঃ

১৯৯২ সালে আলজেরিয়াতে 'ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট' যখন বিপুল ভোটে বিজয়ী হল তখন সেখানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো হল। ৩০ হাজার ইসলামপন্থীকে জেলে ঢুকানো হল। শুরু হল গৃহযুদ্ধ।

ঘ) ফিলিস্তিনঃ

২০০৬ সালে ফিলিস্তিনের নির্বাচনে হামাস বিজয়ী হয়। শুরু হয়ে যায় ইজরায়েল ও পশ্চিমা বিশ্বের হাউকাউ। ইজরায়েল গাজা আক্রমণ করে। শুরু হয় অবরোধ।

ঙ) মিশরঃ

২০১২ সালের জুন মাসে ১ম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে মুহাম্মাদ মুরসি মিশরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু মাত্র ১ বছরের ব্যবধানে ২০১৩ সালের ৩ জুলাই মুরসির বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো হয়। হাজার হাজার কর্মী-সমর্থদের হত্যা করা হয়। বর্তমানে মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতা-কর্মীদেরকে জুডিশিয়াল কিলিংয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যালিম আল ফাত্তাহ সিসি।

[বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ উপরে যাদের কথা বলা হয়েছে, তাদের বেশিরভাগকেই প্রকৃত অর্থে Islamic Party বলা যায় না, বড়জোর ইসলাম ঘেঁষা জাতীয় রাজনৈতিক দল বলা যায়। আর যাদেরকে কিছুটা বলা চলে, তারাও তাদের ক্ষমতাসীন অবস্থায় দ্বীন কায়েম করতে পারে নি, কারন ইসলামী রাষ্ট্রের Very Very Fundamental Criteria পূরন করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে।]

গনতন্ত্র নিয়ে আক্ষেপ করতে গিয়ে এক ভাই একবার বলেছিলেন-

"গনতন্ত্র এমন একটা ধর্ম যা তার অনুসারীদের বেঁধে দেয়, বুলেটের আঘাতে তোমাদের বুক ঝাঁঝরা করে দিলেও তোমরা সর্বোচ্চ রাস্তায় গিয়ে একটু প্ল্যাকার্ড হাতে দাড়িয়ে থাকতে পারবে। আর এতটুকু করতে পারলেই তারা এই ভেবে পরিতৃপ্ত হয়ে যায় যে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় হয়ে গিয়েছে"!!

৯. আমেরিকার RAND ইন্টস্টিটিউশন মডারেট মুসলিমদের যে চারটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছে এবং যেগুলো তারা আমাদের উপর Impose করতে চায়, তার দুটি হল-

১. Accepting Democracy as understood in the liberal western traditions (not in islamic perspective)

২. Acceptance of non sectarian source of law. Those who want laws from a particular scriptures are extremist!!!

বিস্তারিত ইমাম আনোয়ার আল আওলাকির 'The Battles of Hearts & Minds' লেকচারটা শুনুন।

[লিংক- http://www.kalamullah.com/anwar-alawlaki.html // বাংলা অনুবাদ লিখিত ভার্সন-

http://www.pdf-archive.com/২০১৪/০৪/০...tattik-juddho/]

আপনি হয়তো ভাবছেন Democracy গ্রহণ করলেই পশ্চিমারা আপনার উপর খুশি হয়ে যাবে, Moderate মুসলিম ঘোষণা করবে, তা কিন্তু নয়। তারা স্পষ্ট করেই বলেছে সেই গনতন্ত্র নয় যে গণতন্ত্র আপনি বুঝেন বা যা চান, বরং তাদের বক্তব্য একেবারে পরিষ্কার- Accepting Democracy as understood in the liberal western traditions এবং তারা গনতন্ত্রবাদী ইসলামী দল ইস্যুতে বলেছে- as in the case of present Egyptian Muslim Brotherhood is not Enough. প্রিয় পাঠক, লক্ষ্য করুন, RAND ইন্টস্টিটিউশনের সংজ্ঞায় যেটা Moderate Islam আমাদের কাছে তা পরিষ্কার কুফর।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন-

"ইয়াহুদী খৃষ্টানরা কখনই তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের দ্বীনের অনুসরণ কর"। [সূরা বাকারা : ১২০]

১০. প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী হবার সবচেয়ে সহজ কৌশল হল Divide & Rule. মোটাদাগে দেখলে এদেশের অল্পকিছু মানুষ ইসলামপন্থী। অতঃপর বহুদলীয় গণতন্ত্রের ফর্মুলায় এই অল্প সংখ্যক ভোট ভাগ হবে এত্ত এত্ত ইসলামী দলের মাঝে। একদলের শাইখুল হাদীস দাড়াবে, অপরদলে দাড়িবিহীন শিক্ষিত

তরুণ দাড়াবে। অতঃপর সমর্থকদের মাঝে শুরু হবে নোংরা কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ি, গীবত, অপবাদ, আর পরনিন্দার বৃষ্টিধারা। দূর থেকে সেক্যুলার-বামপন্থীরা মজা লুটবে। আসলে গণতন্ত্র আর নির্বাচন এই উম্মাহর মাঝে বিভেদ ও অনৈক্যের বিষফোঁড়া রোপণ করে দিয়েছে। যার ফল আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি। আমাদের দেশে বর্তমানে ইসলামী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ঠিক কতটি তা এই মূহুর্তে বলা মুশকিল তবে অন্তত এতটুকু জেনে রাখা ভালো যে এ দেশে ইসলামী ঐক্যজোটের (?) সংখ্যাই ৪ থেকে ৫ টা (!!)

১১. বর্তমানে নির্বাচনে বিদেশী প্রভাব একটি Open Secret. প্রতিটা ইলেকশনের পূর্বে বিভিন্ন নেতা-নেত্রীদের ভারত আর ওয়াশিংটনমুখী দৌড়াদৌড়ির দৃশ্য তাই খুবই কমন। বলা যায়, দিল্লী-ওয়াশিংটন থেকেই নির্ধারন করা হয়ে থাকে আগামী ৫ বছর কারা এদেশে তাদের Proxy দালাল হিসেবে কাজ করবে। তার উপরে ভোটে কারচুপি, জাল ভোট প্রদান, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, দূর্নীতি, নির্বাচন কমিশনের অবৈধ হস্তক্ষেপ, ক্ষমতার অপব্যবহার (দলীয় সরকার হলে তো কথাই নাই, তথাকথিত নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের ক্ষেত্রে বলা যায়- পাগল আর বেকুব ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ নয়) এগুলো তো আছেই। এই সিরিয়ালে সর্বশেষ সংযোজন হল এক তরফা প্রহসনের নির্বাচন, যেটা কিছু দিন আগে এ দেশের মানুষ খুব ভালোভাবেই প্রত্যক্ষ করেছে। ইসলামী দলতো দূরের কথা, সেক্যুলার দলগুলোরও এক্ষেত্রে কিছুই করার ছিল না। আর গণতন্ত্রের তথাকথিত 'সর্বশক্তির উৎস' বলে পরিচত 'জনগন' তো এ ক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া আর কিছুই করে নি, এমনকি ২/১ টি ফাঁকা বুলিও নয়। আসলে আম জনতার এসব নিয়ে কোন মাথাব্যথাই নেই, 'চাচা তোর আপন প্রান বাঁচা' নিয়েই সবাই ব্যস্ত। দেশের মানুষ প্রহসনের নির্বাচনের আগেও যেমন সারা দিনের ক্লান্তি শেষে ঘুমাতে যেত, এখনও তেমন-ই যায়। দেশের একটি প্রধান রাজনৈক দল, বিএনপি বারবার ওয়াশিংটনের দিকে হাত তুলে মুনাজাত করছিল, কিন্তু ওয়াশিংটন আকার ইঙ্গিতে ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছে, আমরা মুখে যাই বলি না কেন কাজে আমরা তারই পক্ষ নিবো, যারা আমাদের বেশি সুবিধা দিবে আর বেশি গোলামী করবে। সেক্যুলারদের প্রভু ওয়াশিংটনের এই নীতিটি আপনি আরো ভালো করে বুঝবেন গণতন্ত্রের পুরোপুরি বিপরীত রাজতন্ত্রবাদী সৌদিদের সাথে তাদের গভীর সম্পর্ক থেকে। আসলে তাদের দরকার কর্তৃত্ব আর আধিপত্য;

গণতন্ত্রের মন্ত্রতো ওরা জপে কেবল তৃতীয় বিশ্ব ও মুসলিম উম্মাহকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে।

পশ্চিমাদের বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হল সাম্রাজ্যবাদ নীতি। বিভিন্ন মুসলিম দেশে আক্রমন করা, মুসলিম নারীদের ইজ্জত লুণ্ঠন করা, শিশুদের রক্ত ঝরানো, মূল্যবান খনিজ সম্পদ লুটে নেওয়া এগুলো পশ্চিমাদের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য। এজন্যে তারা কখনই কোন দেশে এমন কোন সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে দিবে না যারা তাদের দখলদারিত্বের বিরোধিতা করবে আর নির্যাতিত মুসলিমদের জন্যে জিহাদ পরিচালনা করবে। অথচ এ ব্যাপারে আলেমদের ইজমা হল যখন কাফিররা কোন মুসলিম দেশ আক্রমণ করে তখন আস্তে আস্তে সারা বিশ্বের মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরয হয়ে যায়।

প্রিয় ভাইয়েরা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না-

ক) দ্বীন ইসলামের চির শত্রু ইয়াহুদী- খৃষ্টানরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে একের পর এক ক্রুসেড যুদ্ধ চালিয়েছে, মুসলিমদের প্রথম কিবলা বাইতুল মাকদিস দখল করে রেখেছে, স্পেন থেকে ইসলামের নাম নিশানাটা পর্যন্ত মুছে দিয়েছে।

খ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া মিলে মুসলিমদের ঐক্য ও শক্তির কেন্দ্র খিলাফতকে ধ্বংস করেছে, মধ্যপ্রাচ্যকে ভেঙে খন্ড বিখন্ড করেছে। কামাল আতাতুর্ক নামক গাদ্দারের মাধ্যমে পশ্চিমারা সে সময় কর্যত তুরস্কে ইসলামকেই নিষিদ্ধ করেছিল। ১৯২৪ সালের ২৪ জুলাই, লুজেন চুক্তি (Lausanne Treaty) স্বাক্ষরিত হবার পর হাউস অফ কমন্সে তৎকালীন বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী লর্ড কার্জন ঘোষণা দিয়েছিল যে, "মূল বিষয় হচ্ছে তুরস্ক ধ্বংস হয়ে গেছে এবং এটি আর কোনদিনও মাথা তুলে দাঁড়াবে না। কারণ, আমরা তাদের আধ্যাত্মিক শক্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছি। আর তা হল খিলাফত এবং ইসলাম"। এছাড়া, আল-কুদস এ দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার পর বৃটিশ জেনারেল অ্যালেনবি ঘোষণা করে, "আজ ক্রুসেডের সমাপ্তি ঘটল"। আর, দামেস্ক দখল করে নেবার পর ফরাসী জেনারেল গরো (Gourou) তড়িৎ গতিতে সালাহউদ্দীন আইয়্যুবীর সমাধিস্থলে প্রবেশ করে তার কবরে লাথি মেরে বলেছিল, "উঠো, সালাহউদ্দীন! আমরা আবার ফিরে এসেছি"। বস্তুত খিলাফত ধংসের পর পশ্চিমাদের উল্লাসের কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না।

গ) ইসলামী হুকুমত কায়েমের চেষ্টার জন্যে এবং মুজাহিদীনদের সাহায্য করার জন্যে এরাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হককে হত্যা করেছিল।

ঘ) এরাই সৌদি বাদশা ফয়সালকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করেছে। বাদশা ফয়সালের অপরাধ ছিল তিনি আমেরিকানদের মিত্র ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, মুসলিমদের ১ম কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন এবং পশ্চিমাদের কাছে তেল বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছিলেন!!

ঙ) মুসলিমদের পবিত্র ভূমিতে ১৯৪৮ সালে যখন ইহুদীবাদী ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হল, ইমাম হাসান আল বান্না (রহঃ) দেখলেন তাঁর চোখের সামনে ফিলিস্তিনকে ধ্বংস করা হচ্ছে। তাই তিনি দশ হাজার মুজাহিদ (ঠিকই পড়েছেন ১০ হাজার) নিয়ে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করতে চাইলেন। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৪৮ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার তিন রাষ্ট্রদূত বৈঠক করে তাদের সিদ্ধান্তপত্র মিশরের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠায়। এর ২ মাস পর মিশরের রাজা ফারুকের সরকারী গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান মাহমুদ আব্দুল মাযীদ শহরের সবচেয়ে বড় রাস্তায় ইমাম হাসান আল বান্নাকে হত্যার চেষ্টা করে। এতে তিনি আহত হন। তাকে হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছিল। তখন রাজা ফারুকের আরেক ঘনিষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা মুহাম্মাদ ওয়াসফি পুনরায় ইমাম বান্নাকে গুলি করে হত্যা করে। [ফিলিস্তিনের স্মৃতি/ ড. আব্দুল্লাহ ইউসুফ আযযাম]

১২. আধুনিক কালে নির্বাচন মানেই লক্ষ লক্ষ টাকার ছড়াছড়ি। মিছিল, মিটিং, মাইকিং, পোস্টারিং ইত্যাদিতে কে কাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে সবসময় তারই প্রতিযোগিতা চলে। একগাদা ভাড়া করা ক্যানভাসার যোগাড় করা হয়। কোথাও কোথাও তো অসভ্য নর্তকী আর গায়িকাদেরও ভাড়া করা হয়। এসব ক্যানভাসারদের কাজই হল জোর গলায় নিজ নেতার চরিত্রকে 'ফুলের মত পবিত্র' বলে দাবী করা আর যেকোনভাবে প্রতিপক্ষের নামে দূর্নাম ও কুৎসা রটনা করা। একগাদা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, সুযোগ পেলে আকাশের চাঁদ হাতে এনে দেওয়ার গল্পও ছাড়া হয়। ভোটারদের মনোরঞ্জনের জন্যে ক্ষণে ক্ষণে পান, তামুক, চা, বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা, মদ, গাঞ্জা পরিবেশন হয়। এমন কি প্রয়োজনে নগদ টাকা-পয়সা দিয়ে ভোট কেনা হয়। যে এই কাজ যত বেশি করতে পারবে সে তত বেশি সফল। একজন ইসলামপন্থী না নিজের মিথ্যা গুণগান গাওয়ার জন্য লোক

ভাড়া করতে পারে, না অন্যের নামে মিথ্যা বদনাম রটনা করতে পারে, না মিথ্যা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে পারে, না তরুণদের হাতে মদের বোতল আর বৃদ্ধদের হাতে হুক্কার ডিব্বা ধরিয়ে দিতে পারে, না সে দূর্নীতিবাজদের মত ক্যানভাসে লাখ লাখ টাকা অপচয় করতে পারে, না সে কোটি কোটি টাকা দিয়ে ভোট কেনার মত জগন্য কাজ করতে পারে। এসব যদি সে না-ই পারে তাহলে এই প্রতিযোগিতায় তার কোন স্থান নেই কেননা তথাকথিত নৈতিকতার বুলিতো তো কত আগেই নগদ টাকা-পয়সা আর বিড়ি সিগারেটের গন্ধে কর্পূরের মত উবে গেছে। আর যদি সে এগুলোও করতে পারে তাহলে বুঝতে হবে তার মাঝে ইসলামী চরিত্রের আর ছিটেফোঁটাও নেই। জনপ্রিয়তা অর্জনের স্রোতে গা ভাসিয়ে সব ধুয়ে মুছে একেবারে সাফ হয়ে গেছে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

"আমরা এরূপ ব্যক্তিকে কোন পদে মনোনিত করি না, যে তার পদ চেয়ে নেয় বা পদের প্রতি লালায়িত হয়"। [বুখারী]

১৩. গণতন্ত্রের মাধ্যমে একটা ইসলামী দল যদি ক্ষমতায় আসেও (বাংলাদেশে সে আশা করা নিতান্তই গুড়ে-বালি) তাহলেও তারা ইসলামকে কায়েম করতে পারবে না- ইতিহাস এবং সমীকরণ এটাই বলে। একান্ত যদি পারেও এর পরের ইলেকশনে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাও পেতে পারে। জনগণের মন সবসময়ই পরিবর্তনশীল। সবচেয়ে ভালো শাসনেও তাদের মাঝে 'নদীর এপাড় কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ওপাড়েতে সর্বসুখ আমার এ বিশ্বাস'- টাইপের অনুভূতি কাজ করতে পারে। ফলে আবারও দেশ পরিচালিত হবে কুফরী আদর্শ ও মূলনীতিতে। এভাবে '৫ বছর ইসলাম, ৫ বছর কুফর'– এই অবস্থা তো আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে তৎকালীন কাফিরদের সেই প্রস্তাবের কথা মনে করিয়ে দেয়- "আপনি এক বছর আমাদের ইলাহগুলির ইবাদাত করুন, তাহলে আমরাও পরের বছর আপনার রবের ইবাদাত করবো"।

১৪. ১ম পর্বে আমরা দেখেছি যে পৃথিবীতে ব্যাপক বিস্তৃত একটি খিলাফতের প্রতিশ্রুতি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে দিয়েছেন। এবং এটা প্রত্যেকটা মাটির ঘর বা তাবু পর্যন্তও বিস্তৃত হবে। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ বা জিযিয়ার আহ্বান জানাবে। অন্যথায় তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। কথিত

ভোটাভোটির মাধ্যমে পৃথিবীতে এত বড় পরিবর্তন আসবে বলে বিশ্বাস করাটা কি বোকামী নয়?

১৫. শেষকথা, একটা প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র বিনা আক্রমণে বিশ্বব্যাপী জিহাদ পরিচালনা করবে দ্বীনকে চূড়ান্তভাবে বিজয়ী করার জন্যে। কারন দ্বীন ইসলাম কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের জন্যে নয়, বরং সমগ্র পৃথিবীর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

যদি মুসলিমরা অক্ষম না হয় এবং শত্রুর সাথে কোন চুক্তি না থাকে তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রকে পার্শ্ববর্তী কুফফার রাষ্ট্রে আক্রমন চালাতে হবে এবং তাদেরকে হয় ইসলাম, নয় জিযিয়া, নয় যুদ্ধের নীতিতে আহ্বান জানাতে হবে। এই জিহাদকে জিহাদ আত তালাব বলা হয়। অধিকাংশ আলেমদের মত হচ্ছে বছরে কমপক্ষে ১ বার এই ধরনের আক্রমন পরিচালনা করতে হবে। অন্যদের মত হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমরা সক্ষম ততক্ষণ পর্যন্ত এটি চালিয়ে যেতে হবে এবং এর সর্বনিম্ন কোন সীমা নেই। [দেখুনঃ আল মুগনী ওয়াশ শারহ আল কাবীর/ দশম খণ্ড]

ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীরে কুরতুবীর অষ্টম খন্ডে অনুরূপ কথাই ব্যক্ত করেছেন অর্থাৎ আক্রমণাত্বক জিহাদের ফরযসীমা বছরে অন্তত একবার, এর অধিক ইমামের ইচ্ছাধীন। ইবনে কাসীর (রহঃ) সূরা তাওবার ১২৬ নং আয়াতের ব্যখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন- "তারা (কাফিররা) বছরে ১ বার বা ২ বার যুদ্ধের দ্বারা পরীক্ষিত হয়।" তবে ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) তাঁর ফাতহুল বারীর ৬ নং খন্ডের ২৮ পৃষ্ঠায় ২য় মতটিকেই অধিক শক্তিশালী বলে মন্তব্য করেছেন।

কাজেই কুফফাররা ও তাঁদের দোসররা কখনই নিছক কিছু টিপসই দিয়েই এরূপ রাষ্ট্র হতে দিবে না, কখনই না।

প্রিয় ভাই, আশা করি, উপরের আলোচনায় থেকে আপনার কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কখনই দ্বীন কায়েম করা যাবে না, উম্মাহর ক্ষতের উপশম হবে না, খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। বরং গণতন্ত্র হল একটি ফাঁদ, একটি ধোঁকা, প্রতারণা। হে প্রিয় ভাই, এরপরেও কেন আপনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পক্ষে যুক্তি খুঁজতে চান?? এখনও কেন এই গণতন্ত্রকে আঁকড়ে থাকতে চান?? হে আল্লাহ, আপনি সত্য উপলব্ধির জন্যে আমাদের অন্তরসমূহকে আরো উন্মুক্ত, আরো প্রসারিত করে দিন। আমীন।

মনে রাখবেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

“মুমিন একই গর্ত থেকে দু’বার দংশিত হয় না”। [বুখারী, মুসলিম]

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৫৬

যে কারনে আমি গণতন্ত্রের মানহায পরিত্যাগ করলাম

tayfamansura

Member

১২-০৯-২০১৫

যে কারনে আমি গণতন্ত্রের মানহায পরিত্যাগ করলাম আর আমার পূর্বের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করলাম

¥ মনে হচ্ছে আপনি ইদানীং গণতন্ত্র বিরোধী হয়ে গেছেন??

§ তাই নাকি? তাহলে পক্ষে ছিলাম কবে??

¥ এইতো এর আগে তো আপনিই গণতন্ত্রের পক্ষে 'মোকাবেলাঃ ....' নামে বিশাল এক ব্লগ লিখছিলেন। পাব্লিক তো এইটারে গণতন্ত্রের রেফারেন্স বানায়া ফেলেছিল।

§ ভাই, আমি কখনই গণতন্ত্র সমর্থন করি নি। আমি ঐ ব্লগটি শুরুই করেছিলাম এভাবে- "গণতন্ত্র কুফরি তার মূল কারন দুইটি। যথা...."।

আসলে আমি বলতে চেয়েছিলাম গণতন্ত্র কুফরি হলেও নিজেদের আক্বীদা ঠিক রেখে সাময়িকভাবে এতে অনুপ্রবেশ করা যায়।

¥ এখন কি ঐ নোটের যুক্তিগুলোকে সঠিক মনে করেন না??

§ না। সঠিক ভাবি না। আমি তখন ইসলামের শূরার সাথে গণতন্ত্রকে এক করে দেখেছিলাম যেটা ছিল এক মারাত্মক ভুল। শূরার সাথে পার্লামেন্টের সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্য অনেক বেশি। আর যেটুকু সাদৃশ্যও আছে তা সংবিধানের ইসলামিকরণের পর হবে। সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে আমি জনগণের সার্বভৌমত্বকে আপাত এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে চূড়ান্ত বলেছিলাম। কিন্তু আমার কাছে পরে পরিষ্কার হল যে সার্বভৌমত্বকে ভাগ করা যায় না। আর যদি করাও যায়, তাহলেও গণতন্ত্রের সূত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্বের উপরে জনগণের (আরও নির্দিষ্টভাবে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের) সার্বভৌমত্বকে প্রাধান্য দেয়। সেখানে গিয়ে আপনি

যদি বলেন কুরআনে আছে... হাদীসে আছে... কেউ দাম দিবে না। যদি বলেন এত নং ধারায় অমুক আছে তত নং তমুক আছে তাহলে তাদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য। এই বিষয়ে আমার বর্তমান চিন্তাধারা এখানে [http://wp.me/p৫৭tC৩-D] পাবেন।

আরো মজার বিষয় হলো যদি রাষ্ট্রের সব জনগণ এক হয়ে বলে, "আমরা মদ ও সুদ নিষিদ্ধের আইন চাই, ব্যভিচারের রজম চাই, মুরতাদের মৃত্যুদন্ড চাই" তখন কথিত গণতন্ত্রের বুদ্ধিজীবী, দেশীয় তাগুত ও তাদের বিদেশী প্রভুরা বলবে-

"তোমাদের এসব দাবী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবাধিকার বিরোধী, এগুলো মধ্যযুগীয় বর্বর আইন।"

¥ এই পয়েন্টগুলো তো গণতন্ত্র কুফরি তা প্রমাণ করে। কিন্তু কুফরকে সাময়িক জায়েযের ক্ষেত্রে... ...??

§ জ্বী বলছি। আমি ঐ সিদ্ধান্ত টেনেছিলাম যেসব পয়েন্টের ভিত্তিতে সেগুলো হলঃ
১. হুদাইবিয়ার সন্ধি।

২. মক্কী যুগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাবাচত্বরে নামায আদায়
৩. ইবনে তাইমিয়্যা (রহঃ) অনন্যোপায় হলে দুটি মন্দ থেকে অপেক্ষাকৃত কম মন্দটি গ্রহণ করার নীতি।

৪. রাষ্ট্রে থাকতে হলে তো বিভন্ন নিয়মের অনুসরণ করতেই হয়।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটি কাফির গোত্রের যুদ্ধে একটির জন্য দুআ করেছিলেন প্রমুখ।

১, ২ এবং ৪নং সম্পর্কে আমার বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি KaizenSeries এর ৯ নং পর্বে [http://wp.me/p৫৭tC৩-J] পাবেন। সব রীতিনীতি বা নিয়মের ক্ষেত্রে 'আরবাবাম মিন দুনিল্লাহ' হয় না। আর মনে রাখতে হবে যে আমরা নির্বাচন করতে বাধ্য নই। তাছাড়া নিতান্ত বাধ্য হয়ে মদকে অস্বীকার করে খাওয়া এবং মদকে সাময়িকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া বা জায়েয জেনে খাওয়া এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। ইবনে তাইমিয়্যার নীতিকে আমি ভুল বুঝেছিলাম। শিরকই হচ্ছে সবচেয়ে বড় খারাপ। আর বাধ্য হয়ে হারাম গ্রহণ করার ফিকাহর মধ্যে এগুলো পড়ে না। (কুফরকে স্বীকৃতি নয় কিন্তু!!) ৫নং পয়েন্ট এই আলোচনায় আসে না।

এই বিষয়গুলো আরো পুঙ্খানুপুণখভাবে বুঝার জন্য আমি আপনাদেরকে ‘ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্তের সংশয়সমূহ’ বইটি পরার অনুরোধ করছি। বইটির ডাউনলোড লিংক-

http://www.pdf-archive.com/২০১৪/০৫/০...ongsoy-somuho/

¥ কিন্ত ইউসুফ আঃ তো কাফির রাজার মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছিলেন, নাজ্জাসী শরীআ বাস্তবায়ন না করা সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জানাযা পড়েছিলেন। ইসলাম আসার পরেও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জাহিলী যুগে প্রতিষ্ঠিত আল ফুযুলে কাজ করতে আগ্রহ পোষণ করেছেন।

§ আমি জানি এইসব সস্তা যুক্তি দ্বারা অনেকেই বিভ্রান্ত হচ্ছেন। ইনফ্যাক্ট আমিও হয়েছিলাম। আবু মুহাম্মাদ আসিম আল মাকদিসি তাঁর Democracy : A Religion বইতে এই সবকটি যুক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খন্ডন করেছেন। এবং তিনি এত এঙ্গেল (একমত হয়ে, ভিন্নমত হয়ে, সবদিক) থেকে এটাকে ব্যাখ্যা করেছেন যে আমার মনে হয় না, ঐ বই পড়ার আর কেউ এসব যুক্তি উচ্চারণ করবে। সত্যি বলতে ঐ বইটি ঐ সময় আমার হাতে থাকলে আমি ভুলেও ঐ নোটটি লেখার ধৃষ্টতা দেখাতাম না। বইটির বাংলা অনুবাদের ডাউনলোড লিংক-

http://www.pdf-archive.com/২০১৪/০৫/০...jibon-bebosta/

¥ আপনি কি মনে করেন গণতন্ত্র দিয়ে একেবারেই শরীআ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়??

§ শতভাগ তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে কখনই সম্ভব নয়! ...

¥ যেমন...?

§ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইন পরিবর্তনের সিস্টেম হল বিল উত্থাপন ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা ফলো করা। এখন আপনি যদি এই প্রক্রিয়ায় বিল উত্থাপন ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখিয়ে মদ নিষিদ্ধ করেন, তাও তা হবে একপ্রকার মানবরচিত আইন। কারন এটার breeding process এটাকে তাই বলছে। আমরা বলবো এটা এক প্রকার মানবরচিত আইন কিন্ত ঘটনাক্রমে এটা শরীআ আইনের সাথে মিলে গেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মার্কিন পার্লামেন্টও একসময় মদ নিষিদ্ধ করেছিল।

আর প্রায়োগিক দিক থেকে তো পুরপুরিই অসম্ভব। দয়া করে এই লেখাটা পড়লে ইনশাআল্লাহ আপনিও আমার সাথে একমত হবেন-

http://wp.me/p৫৭tC৩-১১

¥ শেষ প্রশ্ন। যারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ইসলাম কায়েম করতে চাচ্ছে তাদের কি আপনি কাফের মনে করেন??

§ না। আমি তা মনে করি না। 'কোন একটি কাজকে কুফর বলা এবং ঐ কাজসম্পাদনকারীকে কাফের আখ্যায়িত করা' এ দুয়ের মধ্য তফাৎ আছে। কারন তাওয়ীল (কুরআন হাদীসের কোন ভুল ব্যাখ্যা উল্লেখিত ব্যক্তিটি যার শিকার) ও জুহুল (অজ্ঞতা) নির্দিষ্ট করে তাকফিরের (মুকাইয়িন তাকফির) প্রতিবন্ধক হওয়ার জন্য যথেষ্ট। ইনশাআল্লাহ সামনের দিনগুলোতে আমি তাকফিরের প্রকার ও শর্তাবলী, রাষ্ট্রপ্রধানকে তাকফির প্রভৃতি নিয়ে কথা বলবো।

[একসময় আমি গণতন্ত্রের পক্ষে "মোকাবেলাঃ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা কুফরি" শিরোনামে বেশ বড় একটা নোট লিখেছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে আমি সেই অবস্থান থেকে ফিরে আসি। আর এখানে একটি কাল্পনিক কথোপকথনের সেই কারণগুলিই উল্লেখের চেষ্টা করেছি। ¥ দিয়ে একজন কৌতুহলী পাঠক এবং § দিয়ে এখানে নিজেকে বুঝিয়েছি। আল্লাহ আমার ভুল-ত্রুটি মাফ করুন। আমীন]

ঝগড়া বা বিদ্বেষ নয়। ইসলামী পুনর্জাগরণের পথ ও পন্থা বোঝার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টামাত্র। মহান আল্লাহ আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আমীন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৫৭

গণতন্ত্র কুফফারদের খেজুরের তৈরি মূর্তি

tayfamansura

Member

১২-০৯-২০১৫

গণতন্ত্র সেক্যুলারিজমের জারজ প্রোডাক্ট || গণতন্ত্র কুফফারদের খেজুরের তৈরি মূর্তি

Statement ১ : আধুনিক পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র হচ্ছে সেক্যুলারিজমের জারজ প্রোডাক্ট।

Statement ২ : গণতন্ত্র হচ্ছে কুফফারদের 'খেজুরের তৈরি মূর্তি'।

গণতন্ত্র সম্পর্কে উপরের দুটি Statement এর ১মটি Theoretical এবং ২য়টি Practical..

Justification: ১ নং Statement নিয়ে আগে বলি। Secularism শব্দের বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' যেটা একটা ডাহা মিথ্যা এবং সূক্ষ্ম প্রতারণা। প্রকৃতপক্ষে Secularism এর অর্থ হওয়া উচিত 'ধর্মহীনতা'।

মূলত Secularism বলতে ২টি Concept কে বুঝায়- ১. Naturalism ২. Rationalism

অর্থাৎ Secularism = Naturalism + Rationalism

নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারার প্রসারের সাথে সাথে দুটো প্রশ্ন গাঢ় হতে লাগলো।

প্রথমত, বিশ্বজগত কিভাবে সৃষ্টি হল?? ধর্মতাত্ত্বিকরা ধর্মগ্রন্থের আলোকে ব্যাখ্যা দিলো। কিন্তু নাস্তিক সেক্যুলাররা তো আর তা মেনে নিতে পারে না। তাই তারা প্রস্তাব করলো Naturalism মতবাদের। এই মতবাদের সারকথা হল স্রষ্টা বলে কিছু নেই, Nature নিজে নিজেই পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

২য় যে প্রশ্নটি আসলো তা হল সমাজ রাষ্ট্রের আইন কিভাবে তৈরি হবে?? ধার্মিকরা না হয় ধর্মগ্রন্থ ফলো করে। নাস্তিকরা কি করবে?? নাস্তিকরা মীমাংসা দিল যে তারা তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তি কাজে লাগিয়ে আইন তৈরি করবে, কোন

Holy Scripture এর ধার ধরবে না। এটাকে বলা হয় Rationalism. এই Rationalism প্রয়োগ করে সমাজের আইন তৈরির কারখানাই হল আধুনিক পার্লামেন্ট, যেখানে MP দের হ্যাঁ-না-সংখ্যাধিক্যই হল আইন তৈরির প্রক্রিয়া। কাজেই বুঝা গেল Secularism হল নাস্তিকতাবাদের জারজ প্রোডাক্ট, আর আধুনিক পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র হল Secularism এর জারজ প্রোডাক্ট।

২নং Statement টি বেশ কৌতূহলীদ্দীপক।

জাহেলী যুগে উমার (রাঃ) একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর পূজা অর্চনা করার ইচ্ছে হল। কিন্তু আশেপাশে কোন মূর্তি পেলেন না। অগত্যা খেজুর দিয়ে মূর্তি তৈরি করলেন। তারপর অঢেল ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে পূজা-অর্চনা করলেন। কিছুক্ষণ পর ক্ষুধা লাগলো। তখন তিনি সেই মূর্তিটিই (??) ভেঙে খেয়ে ফেললেন!! এটাই হচ্ছে কুফফারদের খেজুরের তৈরি মূর্তি, যখন ইচ্ছা তারা এটাকে ভক্তি করে, পূজা করে, নিজেকে নিবেদন করে আবার যখন ইচ্ছে হয়, যখন প্রবৃত্তি তাড়না দেয়, তখন এটাকে খেয়ে ফেলে!! এবার আসা যাক গণতন্ত্রের ব্যাপারে। এ যমানার কুফফাররা ও তাদের প্রভু আমেরিকা দেশে দেশে গণতন্ত্রের ফেরি করে বেড়ায়। এই গণতন্ত্রকে তারা পূজা করে, অর্চনা করে। এমনকি এই গণতন্ত্রের জন্য তারা যুদ্ধও করে।

আমরা যখন বলি 'আল্লাহ যেটা দিয়েছেন, সেটাই আইন', তখন ওরা বলে "না, পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা যা দিয়েছে তাই আইন।"

[{ আল্লাহ বলেন, "আম লাহুম শুরাকায়ু শারায়ু লাহুম মিনাদ দ্বীন মা লাম ইয়াহযান বিহিল্লাহ" অর্থাৎ "তাদের কি এমন কতগুলো শরীক (উপাস্য/বিধানদাতা) আছে যারা তাদেরকে এমন কতগুলো বিধান দিয়েছে যার নির্দেশ আল্লাহ দেন নি???" (সূরা আশ শূরা : ২১) }]

*** আমাদের বিধানদাতা আল্লাহ আর ওদের বিধানদাতা পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতা!!

কিন্তু যখন দেখা যায় ওদের ফর্মুলা মেনেই ইসলামপন্থীরা ক্ষমতায় আসে, যখন ওদের পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতাও ইসলামী শরীআকে সাপোর্ট করে, তখন ওরা তাদের পূজিত গণতন্ত্রকে খেজুরের মূর্তির মতো চিবিয়ে খেয়ে ফেলে!! তখন ওরা ওদের ব্যালটের উপাস্যকে মনে রাখে না, মনে রাখে না ওদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার

উপাস্যকে!! ঠিক এ ঘটনাই ঘটেছে আলজেরিয়া ও মিশরে। এ কারনেই শাইখ আইমান আল জাওয়াহিরি হাফিঃ বলেছেন- "গণতন্ত্র হল কুফফারদের খেজুরের তৈরি মূর্তি, যখন খুশি তারা এটাকে পূজা করে আবার যখন খুশি তারা এটাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে!!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৫৮

নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের দিক থেকে মানুষ ৪ প্রকার

Ahmad Faruq M

Senior Member

১২-২১-২০১৫

নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের দিক থেকে মানুষ ৪ প্রকারঃ

==========

সুতরাং মুসলমানদের উচিত দীন ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের দৃষ্টিভঙ্গিতে সামনে রেখে ইসলামী নেতৃত্ব সৃষ্টি করা ও ইসলামী শাসন কায়েম করা, যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন সম্ভব হয়। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর আনুগত্য করা সর্বোত্তম ইবাদত। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর আনুগত্য করা সর্বোত্তম ইবাদত। কিন্তু সময় এর মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃংখলা দেখা দেয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছত্রছায়ায় ধন-সম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে আর এটাকে কাঙ্ক্ষিত সম্পদ অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে নেয়। যার ফলে নিজের দীন ও আখিরাত বিনাশ করে **خسر الدنيا والاخرة** এর পাত্রে পরিণত হয়। যেমন, কাব ইবনে মালিক (রা) মহানবী (স)-এর হাদীস বর্ণনা করছেন। হুযূর (স) বলেন:

]ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال أو الشرف لدينه[

“এমন দুটি ক্ষুধার্ত বাঘকে বকরীর পালে যেন ছেড়ে দেয়া হয়েছে যারা বকরীগুলো নিধন কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। একটি হল- মানুষের সম্পদের মোহ ও লোভ, দ্বিতীয় হল- দীনের ক্ষেত্রে মান-মর্যাদাবোধ।” (তিরমিযী এটাকে হাসান বলেছেন)

এ ব্যাপারে মহানবী (স) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, সম্পদ ও ক্ষমতার মোহ দুটি এমন জিনিস যা দীন-ধর্মকে বিনাশ করে দেয়। আর বাস্তব ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় যে, অধিকাংশ ফিতনা-ফাসাদ এ দুটি ক্ষুধার্ত বাঘের কারণেই সংঘটিত হয়ে থাকে। ক্ষুধার্ত এ বাঘ দুটিই প্রকৃতপক্ষে মানব পালকে ছিন্ন-ভিন্ন ও লুণ্ঠন করে ছাড়ে।

মহান আল্লাহ এমন ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন, যার আমলনামা বাম হাতে অর্পণ করা হবে। আর এটা দেখে সে বলে উঠবে:

}ما أغنى عني ماليه * هلك عني سلطانيه {

“আমার ধন-সম্পদ আমর কোন কাজে আসে নাই। আমার ক্ষমতাও *অপসৃত হয়েছে।” (সূরা আল হাক্কা: ২৮-২৯)

রাজত্ব ও ক্ষমতালোভীদের পরিণাম ফিরাউনের ন্যায় এবং সম্পদ জমাকারীর অবস্থা কারূনের ন্যায় হয়ে থাকে।

মহান আল্লাহ কুরআন হাকিমে ফিরাউন ও কারূনের অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেছেন:

}أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق{

“এরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তাহলে দেখতে পেত যে, এদের পূর্ববর্তীগণের পরিণাম কি হয়েছিল। পৃথিবীতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা শক্তিতে ও কীর্তিতে প্রবল পরাক্রমশালী। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন তাদের অপরাধের জন্য এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ ছিল না।” (সূরা মু’মিন: ২১)

আল্লাহ আরো বলেন: **{ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ سورة القصص }**

“ইহা আখিরাতের সেই আবাসযা আমি নির্ধারিত করি তাদেরই জন্য, যারা পৃথিবীতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। আর শুভ পরণাম কেবল মুত্তাকীদের জন্য।” (সূরা কাসাস : ৮৩)

মানুষ সাধারণত চার প্রকারের হয়ে থাকে।

(১) সেসব লোক যারা উচ্চ মর্যাদা, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও সরদারী অভিলাষী আল্লাহর যমীনে এরা বিশৃংখলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। উচ্চ মর্যাদা ও নেতৃত্ব লাভের জন্য এরা কপটতা-শঠতা, ধোঁকাবাজি ইত্যাদি বৈধ বলে ধারণা করে। অথচ এটা কঠিন ও জঘন্যতম অপরাধ। এ জাতীয় রজা-বাদশাহ, রাষ্ট্রপতি ও দুষ্কৃতিকারী

নেতৃবৃন্দ ফিরাউন ও ফিরাউনচক্রের দলভুক্ত। আল্লাহর *সৃষ্টি জগতে এরা নিকৃষ্টতম জীব। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾ سورة القصص

"নিশ্চয় ফিরাউন নিজ দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং তথাকথিত অধিবাসীগণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল; ওদের পুত্রগণকে সে হত্যা করতো এবং নারীগণকে জীবিত রাখতো। সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। (সূরা কাসাস: ৪)

ইবনে আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়েত ক্রমে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন:

»لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذَرَّةٌ مِنْ إِيمَانٍ ". فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ الله: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبِي حَسَنًا، وَنَعْلِي حَسَنًا، أَفَمِنْ الْكِبْرِ ذَاكَ؟ قَالَ: " لَا: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ بطر الحق وغمط الناس[

"যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার বিদ্যমান, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান বর্তমান থাকে।"

কেউ একজন প্রশ্ন করলো, "হে রাসূলুল্লাহ (স)! এটা আমার বড় পছন্দ লাগে যে, আমার পোশাক-পরিচ্ছদ ও জামা-জুতা সুনদ্র দেখাক। তবে এটাও কি অহংকার ও গর্বের অন্তর্ভুক্ত।" জবাবে তিনি বললেন:

"না- এটা গর্ব ও অহংকার নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা সুন্দর, সৌন্দর্যকে তিনি ভালবাসেন। অহংকার হলো, সত্যকে অস্বীকার ও পদদলিত করা এবং মানুষকে নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত মনে করা। (মুসলিম)

এ হলো সে সকল লোকদের অবস্থা, যারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী, নেতৃত্ব০করতখাত্ব, মান-মর্যাদার প্রত্যাশী এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।"

(২) ঐ সকল লোক যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এবং বিশৃংখলার হোতা বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উচ্চমর্যাদা, নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন- চোর-ডাকাত, গুণ্ডা-বদমাশ ইত্যাদি। এ জাতীয অপরাধীগ?ণ সাধারণত সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ও নিম্ন শ্রেণীর লোক হয়ে থাকে।

(৩) যে সকল লোক মান-মর্যাদা, ইয্*যত-সম্মান কামনা করে কিন্তু তারা সমাজে বিশৃংখলা ও বিপর্যয় সৃষ্টিতে আগ্রহী নয়। এরা দীনদার শ্রেণীবুক্ত, যাদের নিকট দীন রয়েছে। আর এ দীনের দ্বারাই তারা মানুষের মধ্যে মান-সম্মান কামনা করে।

(৪) এ পর্যায়ে রয়েছে সে সকল লোক প্রকৃতপক্ষেই যারা জান্নাতের অধিকারী, তারা আল্লাহভক্ত ও হকপন্থী লোক। তারা মান-মর্যাদার অভিলাষী নয়। অধিকন্তু যমীনের বুকে তারা ফাসাদ সৃষ্টিকারীও নয়; তাসত্ত্বেও তারা উচ্চমর্যাদার অধিকারী। মেযন কুরআন করীমে ইরশাদ হয়েছে:

{وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}

“তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না তোমরাই বিজয়ী থাকবে যদি তোমরা মুমিন হও।” (সূরা আলে ইমরান: ১৩৯)

তাতে আরো বলা হয়েছে:

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

“তোমরা বলহীন হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না, তোমরাই বিজয়ী থাকবে; আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো বিনষ্ট করবেন না।” (সূরা মুহাম্মদ: ৩৫)

আল্লাহ আরো বলেছেন: **{وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ}**

“মান-মর্যাদা শক্তিতে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদেরই জন্য।” (সূরা মুনাফিকূন: ৮)

মোটকথা, ক্ষমতাগর্বী ও অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী এমনও রয়েছে, যারা সব চাইতে বেশী ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও পদদলিত, হীনতার চরমে নিপতিত। পক্ষান্তরে অনেক উচ্চমর্যাদাশীল ব্যক্তিও রয়েছে, যারা ফিতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা থেকে

দূরে থাকা সত্ত্বেও মর্যাদর শৈলচূড়ায় বিরাজমান। এটা এ কারণে যে, আল্লাহর সৃষ্টিকুলের উপর আধিপত্য বিস্তারের ধারণা পোষণ করাটা তাদের উপর জুলুমেরই নামান্তর। কেননা, গোটা মানব জাতি একই শ্রেণী একই গোত্রভুক্ত। এমতাবস্থায় এক বক্তি সমগোত্রীয়দের উপর আধিপত্য লাভের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শক্তি ও কৌশল প্রয়োগে আত্মনিয়োগ করে, যাতে অন্যান্যরা তার অধিকার বলয়ে চলে আসে, এটা চরম অত্যাচার। কাজেই এ জাতীয় লোকদের প্রতি সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ ও ক্ষোভের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে আপন ভাইয়ের উপর আধিপত্য সবিস্তার করা, তাকে মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য করার কল্পনাও অচিন্তনীয়। অবশ্য অত্রাচারী জালিম ব্যক্তি চায় যে, সকলের উপর তার প্রাধান্য ও সরদারী কায়েম থাকুক। তাদের নিকটও বিবেক বুদ্ধি রয়েছে। তারা এটা লক্ষ্য করে যে, একজনকে তাদের অন্যের উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। যেমন-

আয়াতাংশে বর্ণিত হয়েছে। ইতিপূর্বে আরো বলা হয়েছে যে, আকার-আকৃতি বিশিষ্ট মানব দেহের সংশোধন তার সেরা অংগে মস্তক ছাড়া সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাকের ইরশাদ হলো:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ{

"তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, সে সম্পর্কে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছেন।" (সূরা আন'আম: ১৬৫)

আল্লাহ আরো বলেছেন:

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا

"তাদের পার্থিব জীবনে আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাতে একে অন্যের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে।" (সূরা যুখরুফ: ৩২)

রাষ্টট্র ও ধন-সম্পদ সার্বিকভাবে আল্লাহর পথে নিয়োজিত রাখা এবং যথাযথরূপে দীনের কাজে ব্যয় করার জন্য ইসলামী শরীয়ত জোর নির্দেশ দিয়েছেন। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যও তাই যে, এর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা, দ্বিতীয়ত আল্লাহর দীন যেন কায়েম ও মজবুত হয়। সুতরাং আল্লাহর পথে যখন ধন-সম্পদ ব্যয় করা হবে, ফলশ্রুতিতে দ্বীন-দুনিয়া উভয় জাহানের কল্যাণ সাধিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে আমীর, সুলতান তথা শাসক যদি ইসলাম থেকে দূরে সরে থাকে, তাহলে জনগণের নৈতিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক সকল দিক নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়।

আল্লাহ পাকের অনুগত বান্দাদের এবং গুনাহগার ও অবাধ্যদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যায় তাদের উদ্দেশ্য ও সৎকাজ দ্বারা। এ প্রসঙ্গে বুখারী-মুসলিমের হাদীসে হুযুর (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন:

»إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَإِلَى أَعْمَالِكُمْ

“আল্লাহ তা’আলা তোমাদের আকৃতি চেহারা ও তোমাদের মালের প্রতি তাকান না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর, তোমাদের আমলের প্রতিই লক্ষ্য করে থাকেন।” (বুখারী ও মুসলিম)

অধিকাংশ রাষ্ট্রপতি, শাসক, আমীর ও রঈস এবং দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন। অর্থবিত্ত, কুলগৌরব, বুযুর্গী ইত্যাদিকে পার্থিব স্বার্থে ও দুনিয়াবী গরজে ব্যবহার করা হয়। তারা ঈমানের মূল ভাবধারা এবং পরিপূর্ণ দীন থেকে সরাসরি বঞ্চিত। অবশ্য তাদের কারো কারো মধ্যে দীনী চেতনাবোধ প্রবল বটে, কিন্তু যদ্বারা এর পরিপূর্ণতা হাসিল হয়, তা থেকে এরা অনবহিত ফলে তারা এ বিষয়গুলো পরিহার করে বসেছে। অপরপক্ষে তাদের কেউ হয়তো এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এ থেকে বিমুখ হয়ে আছেন। আর তা এ জন্যে যে, রাষ্ট্র পরিচালনা, নেতৃত্ব, সরদারী ইত্যাদিকে তারা ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ বলে ধারণা করে নিয়েছেন। বস্তুতঃ তাদের বিশ্বাস হলো যে, এসব দীন ইসলামের পরিপন্থী কাজ। তাদের মতে দীন হলো অপমান ও লাঞ্ছনার নামান্তর। ইয্*যত, সম্মান ও মর্যাদার উচ্চাসন থেকে এরা মূলত বঞ্চি ও মাহরূম।

ইহুদী, নাসারা ধর্মাবলম্বীদের অবস্থাও একই এবং প্রায় অভিন্ন। নিজেদের ধর্মকে তারা অসম্পূর্ণ মনে করে নিজেদেরকে অক্ষম অপরাধী ধারণা করে। তদুপরি দীন প্রতিষ্ঠার কাজে নানাবিধ আপদ-বিপদ লক্ষ্য করে হীনবল হয়ে যায়। দীনকে অপমানকর মনে করে তা পরিত্যাগ করে বসে। ফলে দীনের পরিসীমা সংকোচিত হতে থাকে এবং এমনিভাবে দীন ধর্ম দ্বারা তাদের নিজেদের অথবা অপরের কোন কল্যাণ সাধিত হবার নয়, তাই মূল ধর্মকেই তারা বর্জন করে। এমনি দুটি দীন দুটি পথ একদা ছিল। একদল দেখলো তাদের নিজেদের দীনকে অসম্পূর্ণ উদ্দেশ্যে, তদুপরি দীন প্রতিষ্ঠায় শত বাধা বিঘ্ন দেখে তারা ভীত হয়ে যায়। ফলে দ্বীনী পথ সুকঠিন হয়ে পড়ে। দীনকে অপমানের বস্তু মনে করে তারা দীন পরিত্যাগ কর। তদুপরি দীন প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতা, ধন-সম্পদ ও রণ-কৌশল সম্পর্কিত জ্ঞান অপরিহার্য। তাদের দীন-ধর্ম তাদের চাহিদা পূরণ করতে কার্যত অক্ষম; তাই ঘৃণাভরে মূল ধর্মই ত্যাগ কর এথেকে তারা সরে দাঁড়ায়।

অপর পক্ষীয়রা রাষ্ট্র; অর্থবিত্ত, সামরিক উপায়-উপকরণ সংগ্রহ এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ-বিগ্রহের দিক নির্দেশনা নিজেদের ধর্মীয় ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান দেখতে পায়; কিনতউ দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া তাদের উদ্দেশ্য বহির্ভূত বিধায় আসল ধর্মকেই তারা বিসর্জন দিয়ে স্বস্তির নিঃস্বাস ফেলেছে। পক্ষ দুটি হলো (*****) (অভিশপ্ত) ইহুদী ও (*****) (পথভ্রষ্ট) নাসারা। ইহুদীরা তো (দ্বীনী) রাজত্ব, শাসন, সরদারী সব পরিত্যাগ করছে, খৃষ্টান নাসারাগণ মূল ধর্মই ছেড়ে দিয়েছে।

সুতরাং সিরাতে মুস্তাকীম (সরল-সহজ পথ) তাদেরই গমন পথ যাদের উপর আল্লাহর বিশেষ রহমত-করুণা নাযিল হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে:

"এটা সে সকল লোকদের পথ যাদের উপর আল্লাহ বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। যেমন, নবী (আ), সিদ্দিকীন, শহীদ এবং সৎকর্মপরায়ণ মানুষ।"

হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পর খুলাফায়ে রাশেধীন, সাহাবায়ে কিরাম এবং পরবর্তীকালে তাঁদের অনুগামীদের এই একই পথ, একই তরীকা ছিল।

এ প্রসঙ্গে কুরআনের শাশ্বত বাণী হলো:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা সর্বপ্রথম ঈমানের দাবী অনুযায়ী অগ্রসর হয়েছিল তারা এবং যারা সততার সাথে তাদের অনুসরণ করেছিল, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হলেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হলো। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত, যেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। এটা মহা সাফল্য।" (সূরা তওবা: ১০০)

সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা ফরযে আইন বা অবশ্য কর্তব্য। যার উপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও শাসনভার ন্যস্ত, তার দায়িত্ব ও কর্তব্য এ ব্যাপারে সর্বাধিক। এ দ্বারা সে আল্লাহর আনুগত্য, ইকামতে দীন ও মুসলমানদের কল্যাণ সাধনের কাজ আঞ্জাম দিবে আর রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের পশ্চাতেও এই একই উদ্দেশ্য। কাজেই এ জন্য রাষ্ট্র ও শাসন ক্ষমতার হিফাযত জরুরী। সাধ্যমত হারাম জিনিস থেকে শাসক নিজে বেঁচে থাকবে এবং অপরকেও রক্ষা করতে তৎপর থাকবে। তার ক্ষমতার বাইরে কোন কিছুর জন্য তাকে জিজ্ঞেস করা হবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অসৎ লোকদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা উচিত নয়। অবশ্য যে ব্যক্তি নেতৃত্ব ও সরদারীর মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠা ও আল্লাতর পথে জিহাদ করার দায়িত্ব পালনে অপারগ, সে ততটুকু খিদমতই আঞ্জাম দিবে যতটুকু করতে সে সক্ষম। আন্তরিক ও নিষ্ঠার সাথে জাতীয় কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখবে, উম্মতে মুহাম্মদীর পরস্পরের মহব্বত ও মঙ্গলের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করবে। অধিকন্তু সাধ্যমত কল্যাণ সাধনে ব্যাপৃত থাকবে। কেননা আল্লাহ পাক ক্ষমতার বাইরে কারো উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না বা হুকুম করেন না। আল্লাহর কিতাব কুরআনের পথ নির্দেশনায়ই দীনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কেননা ইহা পথ প্রদর্শক।আর এ ব্যাপারে হাদীসে রাসূলের কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে। এ দুটিকে পথ নির্দেশক বানিয়ে আল্লাহর সাহায্য অর্জন করা যেতে পারে । স্বয়ং আল্লাহও এ বিষয়ে কুরআনে হুকুম আহকাম বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয হলো কুরআন হাকীম ও হাদীসে রাসূল (স)-কে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেয়া। অতঃপর একমাত্র আল্লাহরই নিকট সাহায্য ও মঙ্গল কামনা করতে থাকবে। স্বরণযোগ্য যে, দুনিয়া এজন্যই যে একে দীনের খিদমতে ব্যয় করা হবে। যেরূপ হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) বলেছেন:

يا ابن آدَمَ أَنْتَ مُحْتَاجٌ إِلَى نَصِيبِكَ مِنْ الدُّنْيَا وَأَنْتَ إِلَى نَصِيبِكَ مِنْ الْآخِرَةِ أَحْوَجُ، فَإِنْ بَدَأْتَ بِنَصِيبِكَ مِنْ الْآخِرَةِ مُرَّ بِنَصِيبِكَ مِنْ الدُّنْيَا، فَانْتَظِمْهَا انْتِظَامًا، وَإِنْ بَدَأْتَ بِنَصِيبِكَ مِنْ الدُّنْيَا فَاتَكَ نَصِيبُكَ مِنْ الْآخِرَةِ، وَأَنْتَ مِنْ الدُّنْيَا عَلَى خَطَرٍ

"হে বনী আদম! তুমি তোমার দনিয়ার ও সম্পদের মুখাপেক্ষী, তদ্রূপ আখিরাতেও তোমার সঞ্চয়ের তুমি মুহতাজ কিন্তু আখিরাতের সঞ্চয়ের তুমি অধিক মুখাপেক্ষী। কাজেই তুমি তোমাদের আখিরাতের অংশ নিয়েই কাজ শুরু কর। আর সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার ভাগের জন্য কিছু চেষ্টা করো। কিন্তু যদি তুমি দুনিয়ার সম্পদের চেষ্টায় প্রথম মনোযোগ দাও, তবে তোমার আখিরাতের সম্পদ হারিয়ে বসবে, আর দুনিয়া তোমার জন্য বিপদজনক হয়ে দাঁড়াবে।"

তিরমিযী কর্তৃক রিওয়ায়েত কৃত নবী করীম (স)-এর হাদীস তাঁর উক্তির সমর্থন করে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন:

]من أصبح والآخرة أكبر همه جمع له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلى ما كتب له[

"যে ব্যক্তির এমতাবস্থায় ভোর শুরু হয় যে, আখিরাতের চিন্তাই হয় তার মূখ্য বিষয়, আল্লাহ পাক তার অবস্থা সুসংহত করে দেবেন এবং তার অন্তরে প্রাচুর্যের প্রশান্তি সৃষ্টি করে দেবেন আর দুনিয়া তার নিকট লাঞ্ছিতাবস্থায় হাযির হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় সকাল করে যে, দুনিয়াই হয় তার মূখ্য উদ্দেশ্য, আল্লাহ তার মালামাল বিচ্ছিন্ন করে দেবেন। আর দারিদ্র্য তার চোখের সামনে

উপস্থিত হবে। বস্তুত দুনিয়াতে সে পরিমসাণই পাবে, আল্লাহ পাক তার জন্য যে পরিমাণ লিখে রেখেছেন।”

প্রকৃতপক্ষে এ হাদীসের মূল ভাবধারা কুরআনে হাকীমেও নিহিত বিদ্যমান যেমন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

“আমার দাসত্ব ও নিরঙ্কুষ আনুগত্যের জন্যই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষ এবং জিনকে। তাদের নিকট থেকে আমি রিযক চাই না আর এও কামনা করি না যে, তারা আমার আহার্য যোগাচে। একমাত্র আল্লাহই রিয্*ক দান করেন এবং তিনি প্রবল পরাক্রমশালী সত্তা।” (সূলা আজ জারিয়াত:” ৫৬-৫৮)

পরিশিষ্ট ও দু’আ

মহান আল্লাহর দরবারে আমরা এই বলে দু’আর হাত তুলছি, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে, আমাদের দীনী ভাইদেরকে এবং মুসলিম কাওমের সকলকে তোমার সেই প্রিয় বস্তু দান করো, যাতে তুমি সন্তুষ্ট।

فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا وجميع المسلمين لما يحبه لنا ويرضاه من القول والعمل فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين

সূত্রঃ
শরীয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা" (বইটির শেষের কিছু অংশ)

মূল: ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৬০

পাঁচ স্তরের নামাজীর মধ্যে আপনি কোন স্তরে?

Ubaidullah Hindi

Member

০৫-০৯-২০১৫

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অয়া সাল্লাম বলেনঃ-

"নামাজ দ্বীনের মূল ভিত্তি।"

"কিয়ামতের ময়দানে বান্দার নিকট থেকে নামাজের হিসাবই সর্বপ্রথম নেওয়া হবে।" তাই আমাদের নামাজের ব্যাপারে অনেক বেশি যত্নবান হওয়া উচিত।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর **"আল ওয়াবিলুস চাইয়্যিব মিন কালিমুত তাইয়্যিব"** কিতাবের ১ম খণ্ডের ৩৮ পৃষ্ঠায় বলেনঃ-

"যখন নামাজের সময় হয় তখন পাঁচ স্তরের নামাজী দেখা যায়ঃ

প্রথম শ্রেনী শাস্তিযোগ্যঃ-

প্রথম স্তরের নামাজিরা নিজেদের সাথে নিজেরাই যুলম বা অন্যায় আচরণ করে। এরা ভালোভাবে অযু করে না, সঠিক সময়ে নামাজ পড়ে না এবং এই ধরনের নামাজে নিশ্চিত হয় না যে নামাজের সব জরুরী অংশগুলোই সে পালন করছে।

দ্বিতীয় শ্রেনীর জন্য রয়েছে জবাবদিহিতাঃ-

দ্বিতীয় স্তরের নামাযী শুধু নামাজের বাহ্যিক প্রয়োজনীয় অংশগুলোই পালন করে, তারা সময়মত নামাজ পড়ে এবং ঠিকমত ওযু করে কিন্তু তারা নিজের নফস ও শয়তাবের সাথে জিহাদে পরাজিত হয় এবং নামাজের ভিতরে শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও বিভিন্ন ছন্তা ভাবনায় একাকার হয়ে যায়। ওয়াসওয়াসা থেকে বাচার চেষ্টাও করে না।

তৃতীয় শ্রেনী সালাতে গুনাহ মাফ হবেঃ-

তৃতীয় শ্রেনীর নামাযী হলো তারা যারা নামাজের বাইরের নিয়মাবলী মেনে চলে, সময়মত নামাজ পড়ে, ঠিকমত ওযু করে,নিজের সাথে এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসার বিরুদ্ধে জিহাদ করে, কিন্তু সে সব সময় তার শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত থাকে যখন শয়তান তাঁর নামাজ থেকে কিছু অংশ চুরি করে নিয়ে যায়। সে নামাজ এবং শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ একই সাথে চালিয়ে যায়।

চতুর্থ শ্রেনীর নামাজী পুরষ্কৃত হবেঃ-

চতুর্থ শ্রেনীর নামাজী হলো সে যে নামাজ পড়তে দাঁড়ায় এবং নামাজের সকল শর্তই পূরন করে, তার সম্পূর্ন হৃদয় নামাযেই কেন্দ্রীভূত থাকে, সে থাকে সদা সতর্ক যাতে কোন কিছু বাদ না যায়। তার চিন্তাই থাকে কিভাবে নামাযকে যথাযথ এবং পরিপূর্নভাবে সম্পূর্ন করা যায়। নামাযে আল্লাহর বন্দেগীত তার হৃদয় থাকে গভীর ভাবে নিমজ্জিত।

পঞ্চম শ্রেনীর নামাজে আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য হাসিল হবেঃ-

পঞ্চম শ্রেনীর নামাযী হলো সে যে এগুলোর সবই করে এবং সে তার হৃদয়কে আল্লাহর কাছে সমর্পন করে দেয়, হৃদয় দিয়ে আল্লাহর দিকে তাকায় এবং তার সব চিন্তা ভাবনাকে আল্লাহতে কেন্দ্রীভুত করে, হৃদয় দিয়ে আল্লাহর প্রতি সে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাবোধ পরিপূর্ন হয়, মনে হয় সত্যি সে আল্লাহকে দেখছে। শয়তানের ওয়াসওয়াসা ধুলিস্যাত হয়ে যায়। এবং এই নামাযী এবং তার প্রভুর মধ্যকার সকল প্রতিবন্ধকতা তুলে নেওয়া হয়। তার নামাজের সাথে অন্য কোন ব্যাক্তির নামাজের পার্থক্য হলো বেহেশত এবং দোযখের পার্থক্য থেকেও বেশী। এই ব্যাক্তি যখন নামাজ পড়ে সে তার মালিকের চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে এবং তার প্রতি সে সন্তুষ্ট থাকে।

প্রথম শ্রেনী শাস্তিযোগ্য, দ্বিতীয় শ্রেনীর জন্য রয়েছে জবাবদিহিতা, তৃতীয় শ্রেনী নফস ও শয়তাবের বিরুদ্ধে জিহাদ বা সংগ্রাম করছে সুতরাং তারা পাপি বলে গণ্য হবে না, চতুর্থ শ্রেনী পুরষ্কার এবং পঞ্চম শ্রেনী মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের খুব কাছের মানুষ কারন সে হলো তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যাদের কাছে নামাজ হলো আনন্দ এবং প্রশান্তির উৎস।"

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ এর উক্ত ৫ টি স্তর যদি আমরা মনে রাখি, তাহলে আমাদের নামাজকে পঞ্চম স্তরে উন্নীত করার জন্যে যথাযথ চেষ্টা মুজাহাদা করতে সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

আপনি নিজেকে পরখ করে দেখুন, আপনি কোন স্তরের নামাজী ?! আর দেরী নয় হে ভাই, আজই আপনার নামাজের মানউন্নয়ন করুণ। পঞ্চম শ্রেনীর নামাজী হতে সচেষ্ট হৌন । আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাউফিক দিন। আমীন।

আরবী ইবারত টুকু নিচে দেওয়া হলোঃ-

والناس في الصلاة على مراتب خمسة

الأول : مرتبة الظالم لنفسه المفرط وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها

الثاني : من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار.

الثالث : من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته فهو في صلاة وجهاد

الرابع : من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها واتمامها قد استغرق قلب شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها.

.....

الخامس : من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز و جل ناظرا بقبله إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطوات

وارتفعت حجبها بينه وبين ربه فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض وهذا في صلاته مشغول بربه عز و جل قرير العين به

فالقسم الأول معاقب والثاني محاسب والثالث مكفر عنه والرابع مثاب والخامس مقرب من ربه لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة ، فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز و جل في الآخرة وقرت عينه أيضا به في الدنيا ، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫৬

আল্লাহর যিকির : সুফল ও উপকারিতা

Hazi Shariyatullah

Senior Member

০৭-২১-২০১৫

আল্লাহর যিকির : সুফল ও উপকারিতা

==========

আল্লাহর পবিত্র নামের যে বরকত ও লযযত এবং স্বাদ ও আনন্দ রয়েছে তা অন্য কিছুতে নেই। আল্লাহর যিকির এমন এক শক্তি, যা দুর্বলকে সবল করে এবং সকল বিপদে দৃঢ়পদ রাখে। কারণ আল্লাহর স্মরণকারীর বিশ্বাস এই যে, সব কিছু আল্লাহর হুকুমেই হয় এবং আল্লাহর কোনো ফয়সালা বান্দার জন্য অশুভ নয়। আল্লাহর ফয়সালা মেনে নেওয়ার মাঝেই বান্দার কামিয়াবি ও কল্যাণ। কুরআন মজীদে আল্লাহর যিকির বেশি বেশি করতে বলা হয়েছে। অন্য কোনো ইবাদত সম্পর্কে এমন কথা বলা হয়নি। কুরআন মজীদে আল্লাহর যিকির বেশিবেশি করতে বলা হয়েছে। কারণ আল্লাহর যিকির তথা আল্লাহর স্মরণ এমন এক বিষয়, যা মানুষকে সব ধরনের গুনাহ থেকে রক্ষা করে এবং শরীয়তের হুকুম মোতাবেক চলতে সাহায্য করে। উপরন্তু তা এত সহজ যে, এর জন্য আলাদা করে বেশি সময় ব্যয় করার কিংবা অন্যান্য কাজ স্থগিত রাখার প্রয়োজন হয় না।

আল্লাহর যিকির হচ্ছে যাবতীয় ইবাদতের রূহ। আবু ওসমান নাহদী রাহ. বলেন, কুরআন মজীদের ওয়াদা অনুযায়ী যখন কোনো বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে তখন আল্লাহ তাকে স্মরণ করেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং শোকর গোযারি কর, না-শোকরি করো না।-সূরা বাকারা : ১৫২

সুতরাং আমরা যখন আল্লাহর যিকিরে মশগুল হই তখন একথা স্মরণ করা কর্তব্য যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলাও আমাদেরকে স্মরণ করছেন। এতে যিকিরের স্বাদ ও লযযত বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। যিকিরের ফযীলত সম্পর্কিত কিছু আয়াত ও হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হল।

এক. কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন, (তরজমা) আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলতা অর্জন কর।-সূরা আনফাল : ৪৫

দুই. অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, (তরজমা) যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্বরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়, জেনে রাখ আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।-সূরা রা'দ : ২৮

তিন. আরো বলা হয়েছে, (তরজমা) যারা ঈমানদার তারা এমন যে যখন তাদের সামনে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে।-সূরা আনফাল : ২

চার. আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, যাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় আল্লাহর নাম

পাঁচ. অন্য আয়াতে বলেন, (তরজমা) আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ।-সূরা আনকাবুত : ৪৫

ছয়. আল্লাহর অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও যিকিরকারী নারী, তাদের জন্য আল্লাহর প্রসৃত্তত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।-সূরা আহযাব : ৩৫

সাত. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।-সূরা আহযাব : ৪১

আট. আরো বলেছেন, (তরজমা) স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায়।-সূরা আরাফ : ২০৫

নয়. মুমিনদের সর্ম্পকে বলেছেন, যারা আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় এবং চিন্তা-ভাবনা করে আসমান যমিন সৃষ্টির বিষয়ে। হে আমাদের প্রতিপালক! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি।-সূরা আলে ইমরান : ১৯৯

দশ. মুনাফিকদের বিষয়ে বলেছেন, যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন তারা শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।-সূরা নিসা : ১৪২

এগার. আরো বলেন, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।-সূরা আহযাব : ২০

বার. অন্য আয়াতে বলেন, যে তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে অতপর নামায আদায় করে।-সূরা আ'লা : ১৫

এ জাতীয় আরো আয়াতে যিকিরের কথা বলা হয়েছে। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

এবার কিছু হাদীস পেশ করা হল।

এক. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করতেন।-সহীহ মুসলিম ১/২৮২; সুনানে আবু দাউদ, পৃষ্ঠা ৪

দুই. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি বান্দার সাথে ঐরূপ ব্যবহার করি যেরূপ সে আমার প্রতি ধারণা রাখে। সে যখন আমাকে স্মরণ করে আমি তার সাথে থাকি। সে যদি আমাকে অন্তরে স্মরণ করে আমিও তাকে অন্তরে স্মরণ করি। সে যদি কোনো মজলিসে আমার কথা আলোচনা করে তবে আমি তার চেয়ে উওম মজলিসে তার আলোচনা করি।-সহীহ বুখারী ২/৭৪০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৬৭৫

তিন. হযরত আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে তার প্রতিপালককে স্মরণ করে আর যে করে না তাদের দৃষ্টান্ত হল জীবিত ও মৃতের মতো। (অর্থাৎ যে আল্লাহকে স্মরণ করে সে জীবিত। আর যে স্মরণ করে না সে মৃত)।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬৪০৭; মুসলিম, হাদীস : ৭৭৯

চার. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার পথে জুমদান পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে চলছিলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা চলতে থাক এই যে জুমদান পাহাড়। মুফাররিদরা অগ্রগামী

হয়েছে। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুফাররিদরা কারা? তিনি বললেন, ঐসব নারী ও পুরুষ, যারা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৬৭৬

পাঁচ. হযরত আবূ দারদা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিসের কথা বলব না, যা তোমাদের সমস্ত আমলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সবচেয়ে পবিত্র; তোমাদের মর্যাদাকে আরো বুলন্দকারী; আল্লাহর রাস্তায় সোনা-রুপা খরচ করা থেকে এবং জিহাদের ময়দানে শত্রুর প্রাণ নেওয়া ও শত্রুর হাতে প্রাণ দেওয়া থেকেও উত্তম? সাহাবারা বললেন, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, তা হল আল্লাহর যিকির।-জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩৩৭৭; ইবনে মাজাহ, হাদীস : ৩৭৯০

ছয়. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন। ... ঐ ব্যক্তি, যে একান্তে আল্লাহকে স্মরণ করেছে এবং তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছে।-বুখারী, হাদীস : ৬৪৭৯

সাত. হযরত মুআয রা. থেকে বর্ণিত। এক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে ইসলামের বিধান অনেক মনে হয়। তাই আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন যার উপর আমি সর্বদা আমল করতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার জিহবাকে আল্লাহর যিকিরে তরতাজা রাখ।-জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩৩৭৫; ইবনে মাজাহ, হাদীস : ৩৭৯৩

আট. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আমার বান্দা! তুমি যখন নির্জনে আমাকে স্মরণ কর তখন আমিও তোমাকে নির্জনে স্মরণ করি। আর যখন তুমি আমাকে কোনো মজলিসে স্মরণ কর তখন আমি তার চেয়ে উত্তম মজলিসে তোমার আলোচনা করি।-শুআবুল ঈমান, হা. ৫৫১

নয়. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, এক হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দা যতক্ষণ আমাকে স্মরণ করতে থাকে এবং আমার যিকিরের কারণে তার ঠোঁট নড়তে থাকে, ততক্ষণ আমি তার সাথে থাকি। (অর্থাৎ আল্লাহর

রহমত তার সাথে থাকে)।-মুসনাদে আহমাদ, হাদীস : ১০৯৬৮; ইবনে মাজাহ, হাদীস : ৩৭৯২

দশ. হযরত আবু হুরায়রা রা. ও হযরত আবু সায়ীদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কিছু মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে তখন ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখেন,আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয়,এবং তাদের উপর ছাকিনা নাযিল হয়, আর আল্লাহ তাআলা তার নিকটতম ফেরেশতাদের সামনে তাদের কথা উল্লেখ করেন।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৭০০;

শুআবুল ঈমান, হাদীস : ৫৩০

এগার. হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর যিকিরের চেয়ে আযাব থেকে অধিক নাজাত দানকারী আর কোনো আমল নেই।-মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস : ১৬৭৪৫

বার. হযরত আনাস রা: থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কিছু মানুষ আল্লাহর যিকিরের জন্য একত্রিত হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিই একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তখন আসমান হতে একজন ঘোষক ঘোষণা করেন, তোমাদেরকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে এবং তোমাদের গোনাহসমূহ নেকীতে পরিণত হয়েছে।- মুসনাদে আহমদ ৩/১৪২, হাদীস : ১২৪৫৩; শুআবুল ঈমান, হাদীস : ৫৩৪

তের. হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন জান্নাতের বাগানসমূহের নিকট দিয়ে যাও তখন সেখানে খুব বিচরণ কর। সাহাবারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতের বাগান কী? তিনি বললেন, যিকিরের হালকাসমূহ।-তিরমিযী, হাদীস : ৩৫১০; শুআবুল ঈমান, হাদীস : ৫২৯

চৌদ্দ. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশ করার পর জান্নাতবাসীরা দুনিয়ার কোনো জিনিসের জন্য আফসোস করবে না, শুধু ঐসময়ের জন্য আফসোস করবে, যা দুনিয়াতে আল্লাহর যিকির ছাড়া অতিবাহিত করেছে।-শুআবুল ঈমান, হাদীস : ৫১২; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস : ১৬৭৪৬

পনের. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা: থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর যিকির এত বেশী করতে থাক যে, লোকেরা পাগল বলে।-মুসনাদে আহমদ ৩/৬৮, ৭১, হাদীস : ১১৬৫৩; ইবনে হিববান, হাদীস : ৮১৪

ষোল. হযরত আবু হুরায়রা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল বস্তু অভিশপ্ত তবে আল্লাহর যিকির ও তার সাথে সং©র্শস্নষ্ট বিষয় এবং আলেম ও তালেবে ইলম ছাড়া।-তিরমিযী, হাদীস : ২৩২২; ইবনে মাজাহ, হাদীস : ৪১১২

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনুল কাইয়্যিম রাহ. যিকিরের ফযিলত সম্পর্কে 'আলওয়াবিলুছ ছাইয়িব' নামে একটা কিতাব লিখেছেন। তাতে যিকিরের ফায়দা ও ফযিলত সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ঐ কিতাবে তিনি যিকিরের একশরও বেশি ফায়দা উল্লেখ করেছেন। কিছু ফায়দা এখানে তুলে ধরা হল।

১. যিকির শয়তানকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং তার শক্তি নষ্ট করে দেয়।

২. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়।

৩. দুশ্চিন্তা দূর করে।

৪. প্রশান্তি দান করে।

৫. অন্তর ও শরীরে শক্তি যোগায়।

৬. চেহারা ও অন্তরকে নূরানী করে।

৭. রিযিকে বরকত আনে।

৮. যিকিরকারীর মাঝে মাধুর্য ও গাম্ভীর্য সৃষ্টি করে।

৯. আল্লাহর মহববত পয়দা করে। আর মহববতই হচ্ছে ইসলামের রূহ দীনের কেন্দ্র এবং মুক্তি ও সৌভাগ্যের উপায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর মহববত পেতে চায় সে যেন বেশী বেশী যিকির করে।

১০. যিকির মোরাকাবার পক্ষে সহায়ক, যা যিকিরকারীকে এহসানের মাকামে পৌঁছে দেয়। আর এই মাকামে পৌঁছলে বান্দার এমন ইবাদত নছীব হয় যেন সে আল্লাহকে দেখছে।

১১. যিকির মানুষকে আল্লাহমুখী করে। ঘরে বাইরে তার হালত এমন হয় যে, সকল বিষয়ে আল্লাহ তাআলাকেই সাহায্যকারী মনে করে এবং যাবতীয় বিপদ আপদে তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করে।

১২. আল্লাহর নৈকট্য হাসিল হয়। যিকির যত বেশী হবে নৈকট্যও তত বৃদ্ধি পাবে। আর যিকির থেকে যতই গাফলতি করা হবে ততই আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাবে।
১৩. আল্লাহর মারেফাতের দরজা খুলে যায়।

১৪. অন্তরে আল্লাহর ভয় ও বড়ত্ব সৃষ্টি হয় এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাকে দেখছেন, এই অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

১৫. স্বয়ং আল্লাহ যিকিরকারীকে স্মরণ করেন।

১৬. দিলকে জিন্দা করে।

১৭. যিকির হল দিল ও রূহের গিযা। খাদ্যের অভাবে শরীর যেমন দুর্বল হয়ে পড়ে, তেমনি যিকিরের অভাবে দিলও মৃতপ্রায় হয়ে যায়।

১৮. দিলের মরিচা দূর করে। দিলের মরিচা হল খাহেশাত ও গাফলত। যিকির তওবা, ইস্তেগফারের মাধ্যমে তা দূর হয়।

১৯. গুনাহ মাফ হয়। কারণ যিকির হল সর্বোত্তম নেক আমলসমূহের অন্যতম। আর নেক আমলের মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয়ে থাকে।

২০. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং সম্পর্কহীনতা দূর করে। গাফিল আল্লাহ থেকে দূরে থাকে, শুধু যিকিরের মাধ্যমেই এই দূরত্ব দূর হয়।

২১. বান্দা তার প্রতিপালকের যে সমস্ত তাসবীহ আদায় করে যে কারণে কঠিন মুহূর্তে আল্লাহ তাকে স্মরণ করবেন।

২২. যে ব্যক্তি সুখ ও সচ্ছলতায় আল্লাহকে স্মরণ করে, দু:খ ও মুছিবতে আল্লাহ তাকে স্মরণ করেন।

২৩. যিকির আল্লাহর আযাব থেকে নাযাত দান করে।

২৪. যিকিরের কারণে ছাকিনা ও রহমত নাযিল হয়। ফেরেশতারা চতুর্দিক থেকে যিকিরকারীকে ঘিরে রাখে।

২৫. যিকিরের বরকতে গীবত, চোগলখুরী, মিথ্যাকথা, বেহুদা কথা ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যিকিরে অভ্যস্ত ব্যক্তি এই সব কাজ কর্মে লিপ্ত হয় না। পক্ষান্তরে যিকিরের বিষয়ে উদাসীন লোকেরা এই সব কর্মে লিপ্ত থাকে।

২৬. যিকিরের মজলিস ফেরেশতাদের মজলিস। আর গাফলতি ও বেহুদা কথাবার্তার মজলিস হল শয়তানের মজলিস।

২৭. যিকিরের কারণে যেমন যিকিরকারী উপকৃত হয় তেমনি আশেপাশের লোকেরাও উপকৃত হয়। আর বেহুদা কথাবার্তায় লিপ্ত ব্যক্তি নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তার আশেপাশের লোকেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২৮. যিকিরকারী কেয়ামতের দিন আফসোস করবে না। হাদীসে আছে, যে মজলিসে আল্লাহর যিকির হয় না। কেয়ামতের দিন তা আফসোস ও ক্ষতির কারণ হবে।

২৯. নির্জনে আল্লাহর স্মরণে যার চোখ থেকে অশ্রু ঝরে সে কেয়ামতের দিন আরশের শীতল ছায়ায় স্থান পাবে। যখন মানুষ প্রচন্ড গরমে ছটফট করতে থাকবে।

৩০. দোয়াকারী দোয়ার মাধ্যমে যা কিছু পায় যিকিরকারী যিকিরের কারণে তার চেয়ে অনেক বেশি পায়।

৩১. যিকির যদিও সহজ ইবাদত কিন্তু তা সমস্ত ইবাদত থেকে উত্তম। সহজ এই জন্য যে, শুধু যবান নড়াচড়া করা সমস্ত অঙ্গ-পতঙ্গ নড়াচড়া করা থেকে সহজ।

৩২. আল্লাহর যিকির জান্নাতের চারাগাছ।

৩৩. যিকিরের মাধ্যমে যত পুরুস্কার ও ছওয়াব পাওয়া যায়। অন্য কোন আমলের দ্বারা তা পাওয়া যায় না।

৩৪. যে সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ তাকে রহমতের সাথে স্মরণ করেন। আর যে আল্লাহকে ভুলে যায় আল্লাহও তাকে ভুলে যান। আল্লাহ যাকে ভুলে যান

দুনিয়া ও আখেরাতে তার চেয়ে দুর্ভাগা আর কে হতে পারে? সুতরাং যিকির হল সৌভাগ্য লাভ করার ও দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়।

৩৫. যিকির মানুষকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর রেযামন্দির পথে ধাবমান রাখে। বিছানায়, বিশ্রামে, সুস্থতায়, অসুস্থতায়, দুনিয়ার কাজকর্মে সর্বাবস্থায় যিকিরের মাধ্যমে উন্নতির পথে চলমান থাকা সম্ভব। যিকির ছাড়া আর কোন আমল নেই, যা সর্বাবস্থায় জারি রাখা যায়। ফলে যিকিরকারী বিছানায়, বিশ্রামরত অবস্থায় ও ঐ ব্যক্তির চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যায়, যে গাফেল অবস্থায় রাত্রী জাগরণ করে।

৩৬. যিকির দুনিয়ার জীবনে নূর ও আলো, কবরের জগতে নূর ও আলো এবং আখেরাতে ও পুলসিরাতে নূর ও আলো। অন্য কিছুই বান্দাকে এত নূর ও নূরানিয়াত দান করে না।

৩৭. আল্লাহর স্মরণ ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়।এটি আল্লাহওয়ালাদের তরীকা এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উপায়।অতএব যিকিরের দরজা যার জন্য উন্মুক্ত হয়েছে তার জন্য আল্লাহর নৈকট্যের দরজা উন্মুক্ত হয়েছে। অতএব সে যেন যাহেরী ও বাতেনী পবিত্রতা অর্জন করে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে। যে আল্লাহকে পেল সে সব পেল আর যে আল্লাহকে পেল না সে কিছুই পেল না।

৩৮. অন্তরের একটি চাহিদা আছে, যা যিকির ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে পূরণ হয় না। যিকির যখন অন্তরে বদ্ধমূল হয় এবং অন্তরই হয় প্রকৃত যিকিরকারী। আর যবান হয় তার অনুসারী,তখন তা শুধু অন্তরের চাহিদাকেই পূরণ করে না বরং যিকিরকারীকে সম্পদ ছাড়াই ধনী করে দেয়। আত্মীয়-স্বজন ও জনবল ছাড়াই শক্তিশালী বানিয়ে দেয় এবং ক্ষমতা ছাড়াই প্রভাবশালী বানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যিকির থেকে গাফেল সে ধন সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন ও রাজত্ব থাকা সত্ত্বেও লাঞ্ছিত, অপমানিত ও শক্তিহীন হয়ে যায়।

৩৯. যিকির বিক্ষিপ্তকে একত্র করে এবং একত্রকে বিক্ষিপ্ত করে। দূরবর্তীকে নিকটবর্তী করে এবং নিকটবর্তীকে দূরবর্তী করে।বিক্ষিপ্তকে একত্র করার অর্থ হল, মানুষের ইচ্ছা, সংকল্প ও একগ্রতা ফিরিয়ে দেয় এবং তা শক্তিশালী করে। আর একত্রকে বিক্ষিপ্ত করার অর্থ মানুষের অন্তরের দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী দূর করে দেয়। যিকিরের মাধ্যমে পেরেশানি দূর হয় এবং অন্তরে প্রশান্তি আসে। তেমনি

কৃতকর্মের ফলে যে পাপরাশি একত্র হয়েছে যিকির তা দূর করে এবং আমলনামাকে পাপমুক্ত করে। তেমনি শয়তানের যে বাহিনী মানুষকে ঘেরাও করে যিকির তাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। মানুষ যত আল্লাহর পথে আগুয়ান হয় এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কে গড়তে সচেষ্ট হয়, ততই শয়তান তার বাহিনীকে মানুষের প্রতি ধাবিত করে। যিকির ছাড়া এই বাহিনীকে পরাস্ত করার আর কোনো উপায় নেই।

৪০. যিকির মানুষের অন্তরকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে। অন্তর যখন ঘুমন্ত থাকে তখন সে লাভ ও পুঁজি দুটো থেকেই বঞ্চিত থাকে। এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর যখন সে জাগ্রত হয় এবং কী হারিয়েছে তা বুঝতে পারে তখন ক্ষতিপূরণের জন্য কোমর বাঁধে। গাফলত ও উদাসীনতার গভীর নিদ্রা থেকে যিকিরই মানুষকে জাগ্রত করতে পারে।

৪১. যিকির একটি বৃক্ষ তাতে মারেফাতের ফল ধরে। আল্লাহর মারিফাত ও মহববতই হচ্ছে আল্লাহ প্রেমীদের পরম লক্ষ। সুতরাং যিকির এই লক্ষ্য পূরণের প্রধান অবলম্বন। যিকির বৃক্ষ যত বড় হবে তাতে তত বেশি ফল ধরবে।

৪২. যিকির প্রথমে মানুষকে জাগ্রত করে তারপর তাকে তাওহীদ পযন্ত পৌঁছে দেয়।যা সকল মাকাম ও মারিফাতের মূল।

৪৩. যে আল্লাহর যিকির করে আল্লাহ তার সঙ্গে থাকেন। অর্থাৎ তাকে ভালবাসেন এবং তার সাহায্য করেন।

৪৪. যিকির গোলাম আযাদ করা, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ও মুজাহিদকে সওয়ারী দ্বারা সহযোগিতা করার সমতুল্য।

৪৫. যিকির হচ্ছে শোকর গোযারির প্রধান উপায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে না প্রকৃতপক্ষে সে তার শোকর আদায় করেনা।

৪৬. আল্লাহর নিকট ঐ মুত্তাকি বান্দা বেশি সম্মানিত যার যবান আল্লাহর যিকিরে তরতাজা থাকে। যে আল্লাহর ভয়ে তার আদেশ নিষেধ মেনে চলেছে এবং সর্বদা আল্লাহর যিকির করেছে । তাকওয়া ও পরহেযগারের কারণে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। এবং জাহান্নাম থেকে নাযাত দিবেন । এটা হল তার কর্মের প্রতিদান। আর যিকিরের কারণে সে লাভ করবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য। এটা হল তার বিশেষ মর্যাদা।

৪৭. মানুষের অন্তরের কাঠিন্য যিকির ছাড়া অন্য কিছুর দ্বারা দূর হয় না। তাই বান্দার কর্তব্য দিলের কাঠিন্যকে আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে দূর করা।

৪৮. যিকির হল দিলের যাবতীয় রোগের চিকিৎসা। যে দিল আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন তা রোগাক্রান্ত। তার উপশমের উপায় হল আল্লাহর যিকির।

৪৯. যিকির হল আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার প্রধান উপায়। আর যিকির হতে গাফেল থাকাই আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও নারাজির প্রধান কারণ। সুতরাং বান্দা যখন আল্লাহর যিকির করতে থাকে তখন সে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উদাসীন থাকে সে ধীরে ধীরে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায় এবং আল্লাহ তাকে অপছন্দ করতে থাকেন।

৫০. যিকিরের মতো আল্লাহর নেয়ামত আকর্ষণকারী এবং আল্লাহর আযাব দূরকারী আর কোনো জিনিস নেই।

৫১. যিকিরকারীর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় এবং ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করে। আর এটাই হল পূর্ণ সফলতা ও কামিয়াবি।

৫২. যে ব্যক্তি দুনিয়াতে থেকেই জান্নাতের বাগানে বিচরণ করতে চায় সে যেন যিকিরের মজলিসে শামিল হয়। কারণ এই মজলিস হল জান্নাতের বাগান।

৫৩. যিকিরের মজলিস হল ফেরেশতাদের মজলিস। কারণ একমাত্র যিকিরের মজলিসেই ফেরেশতারা শামিল হয়ে থাকেন।

৫৪. আল্লাহ তাআলা যিকিরকারীদের নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করেন।

৫৫. যে ব্যক্তি যিকিরে অভ্যস্ত সে হাসতে হাসতে জান্নাতে যাবে।

৫৬. যাবতীয় আমলের মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহর যিকির ও স্মরণ।

৫৭. সমস্ত আমলের মধ্যে সেই আমল সর্বোত্তম, যাতে বেশি বেশি যিকির করা হয়। সুতরাং সর্বোত্তম রোযাদার ঐ ব্যক্তি, যে রোযার হালতে বেশি বেশি যিকির করে। সর্বোওম হাজী ঐ ব্যক্তি, যে হজ্ব আদায়কালে বেশি বেশি যিকির করে। তেমনি সর্বোত্তম মুজাহিদ ঐ ব্যক্তি, যে জিহাদের হালতে বেশি বেশি আল্লাহকে স্বরণ করে। অন্যান্য আমলের অবস্থাও হবে একই রকম।

৫৮. আল্লাহর যিকির সকল নফল ইবাদতের স্থলাভিষিক্ত, তা দৈহিক হোক বা আর্থিক।

৫৯. যিকিরের মাধ্যমে অন্যান্য ইবাদত সহজ হয়ে যায়। কারণ যে বেশি বেশি যিকির করে সে আল্লাহর ইবাদতে লয্যত অনুভব করে ফলে তার ক্লান্তি ও অবসাদ থাকে না। পক্ষান্তরে যে আল্লাহর যিকির থেকে গাফিল থাকে সে কোনো ইবাদতে লয্যত পায় না। ফলে ইবাদত তার জন্য কষ্ট ও ক্লান্তির বিষয়ে পরিণত হয়।

৬০. যিকিরের দ্বারা কঠিন কাজ সহজ হয় এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সুতরাং আল্লাহর যিকির এমন এক নেয়ামত, যা সকল মুশকিলকে আসান করে দেয়।

৬১. যিকিরের কারণে ভয়ভীতি দূর হয় এবং প্রশান্তি লাভ হয়। এমনকি ভয়ভীতির অবস্থাগুলোও যাকিরের জন্য প্রশান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়ে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে যে যিকির থেকে গাফিল থাকে সে সর্বদা ভীতিগ্রস্ত থাকে। এমনকি শান্তি ও নিরাপত্তার উপায় ও উপকরণও তার জন্য ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৬২. যিকিরের দ্বারা মানুষ এক বিশেষ শক্তি লাভ করে, যার দ্বারা অতি কঠিন কাজও তার জন্য সহজ হয়ে যায়।

৬২. আখিরাতের জন্য যারা কাজ করে তারা সবাই যেন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত । আর তাদের মধ্যে যিকিরকারীই হল অগ্রগামী। তবে ময়দান যেহেতু ধুলার ঝড়ে আচ্ছন্ন তাই এখনই তা দৃষ্টিগোচর হচেছ না। যেদিন এই ধুলার পর্দা সরে যাবে সেদিন সবাই পরিষ্কার দেখতে পাবে যে, যাকিরীনের জামাত সবার আগে লক্ষ্যে পৌঁছেছে।

৬৩. যিকিরকারী আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সত্যবাদিতার সনদ লাভ করে, কারণ যে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং আল্লাহর গুণাবলি বর্ণনা করে সে তার কথায় সত্য এবং আল্লাহ তাকে সত্যবাদী বলেন। আর আল্লাহ যাকে সত্যবাদী বলেন তার হাশর মিথ্যাবাদীদের সাথে হতেই পারে না।

৬৪. যিকিরের দ্বারা জান্নাতে ঘর তৈরি হয়। বান্দা যখন যিকির করে ফেরেশতারা জান্নাতে তার জন্য ঘর তৈরি করেন আর যখন যিকির বন্ধ করে তখন ফেরেশতারাও তাদের কাজ বন্ধ রাখেন।

৬৫. যিকির হল জাহান্নাম ও আল্লাহর বান্দার মাঝে দেয়াল স্বরূপ। বদআমলের কারণে মানুষ যখন জাহান্নামের পথে চলতে থাকে তখন যিকির তার সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই যিকির যত বেশি হবে প্রাচীর তত মজবুত ও নিশ্ছিদ্র হবে।

৬৬. ফেরেশতারা যেমন তাওবাকারীর জন্য ইস্তিগফার করেন তেমনি যিকিরকারীর জন্যও আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করেন।

৬৭. যে ভূখন্ডে আল্লাহর যিকির করা হয় তা অন্যান্য ভূখন্ডের সাথে গর্ব করে থাকে।

৬৮. বেশি বেশি যিকির করা মোনাফেকী হতে নিরাপদ থাকার উপায়। কারণ মুনাফেকরা আল্লাহ তাআলাকে খুব অল্প স্মরণ করে।

৬৯. যিকিরের মাঝে এক বিশেষ স্বাদ রয়েছে, যা অন্য কোনো আমলে পাওয়া যায় না। এই স্বাদ ও লযযত ছাড়া অন্য কিছুই যদি যিকিরের দ্বারা পাওয়া না যেত তবুও তা তার জন্য যথেষ্ট হত। এই কারণে যিকিরের মজলিসকে জান্নাতের বাগান বলা হয়।

৭০. যিকির চেহারায় সজিবতা দান করে। আর আখেরাতে নূর ও আলো দান করবে। এ কারণে দুনিয়াতে আল্লাহর যিকিরকারীর চেহারা থাকে সবচেয়ে সজীব আর আখিরাতে তা হবে সবচেয়ে নূরানী ও আলেকিত।

৭১. যে ব্যক্তি ঘরে-বাইরে সব জায়গায় বেশি বেশি যিকির করে কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্যদানকারী হবে অনেক বেশি। কারণ এসকল ভূখন্ড, বৃক্ষলতা, ঘরবাড়ি, সব তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

৭২. যবান যতক্ষণ যিকিরে মশগুল থাকবে ততক্ষণ মিথ্যা, গীবত, বেহুদা কথাবার্তা থেকে নিরাপদ থাকবে। কারণ যবান তো চুপ থাকে না, হয় আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকবে, নতুবা বেহুদা কথাবার্তায় লিপ্ত থাকবে। দিলের অবস্থাও অনুরূপ। দিল যদি আল্লাহর মহববতে মশগুল না হয় তাহলে মাখলুকের মহববতে মশগুল হবে।

৭৩. শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। সব সময় তাকে আতঙ্কিত করে রাখে এবং চতুর্দিক থেকে তাকে ঘেরাও করে রাখে। এর থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল

আল্লাহর যিকির। যে যত যিকির করবে সে তত বেশি শয়তানের হামলা থেকে নিরাপদ থাকবে।

এই জাতীয় অনেক ফায়দা ইবনুল কাইয়্যিম রাহ. তার কিতাবে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বেশি বেশি যিকির করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের অন্তরকে আলোকিত করে দিন। যিকিরের দ্বারা আমাদের জীবন যেন সুন্দর হয় এবং আমরা যেন দুনিয়া ও আখিরাতে এর বরকত লাভ করি।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩৪২